সংস্কৃতির বাতিঘর

টাঙ্গাইল

সংস্কৃতির বাতিঘর
টাঙ্গাইল

সম্পাদনায়
কুইন ইউসুফজাই

সংস্কৃতির বাতিঘর-টাঙ্গাইল
কুইন ইউসুজাই
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : ছায়ানীড়
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৪০০/-(চারশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৭-৪
ISBN: 978-984-97987-7-4
Songskritir Batighar-Tangail by Quine Usujai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Chayanir, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 400/- (Four Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন−http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

টাঙ্গাইল জেলার সংস্কৃতির উৎকর্ষে
যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ।

ভূমিকা

মানব সমাজে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। সংস্কৃতি মানব মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে আর সে সব সংস্কৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। বাংলা সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে রয়েছে, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা, যাদুবিদ্যা, ক্রীড়া ইত্যাদি। বাস্তবিক অর্থে সংস্কৃতির একেকটি শাখাই বিশাল সমুদ্র সদৃশ। আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথাই ধরা যাক, আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' কিংবা মাহবুবুল আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কিংবা মুর্তজা বশীরের স্কেচগুলো জাতিকে দারুণ উন্মাদনায় জাগ্রত করেছে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র', জল্লাদের দরবারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কামরুল হাসানের ইয়াহিয়ার মুখচ্ছবি সংবলিত 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন তৎপরতা মুক্তিযোদ্ধাসহ সমগ্র বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে। বিভিন্ন উপলক্ষসহ সংস্কৃতির মাধ্যমসমূহ আমাদের অমূল্য সম্পদ। জেলা হিসেবে টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। টাঙ্গাইলের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে জনসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি, নন্দন সংস্কৃতি, শিল্প সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। স্থানীয়ভাবে যাত্রাপালা, সংযাত্রা, নাটক, জারি, ধুয়া, ঘাটুগীত, বাউলগান, কবিগান, নৃত্য ইত্যাদিতে একসময় সারা জেলা মুখরিত হতো।

জাতীয়ভাবে এ জেলার অনেক তারকা প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রাতঃস্মরণীয় নাম যাদুসম্রাট পিসি সরকার। টাঙ্গাইল জেলার এই সূর্যসন্তান জাদুশিল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তান আমলে নাটকে সাঈদ সিদ্দিকী, মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক অনন্য নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ। নাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে তার পারফরমেন্স অসাধারণ। নাটকের আধুনিকায়নে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সঙ্গীতে চলচ্চিত্রে অসাধারণ অবদান রয়েছে লোকমান হোসেন ফকিরের। তার রচিত সঙ্গীতে, ভূপেন হাজারিকার মতো কালজয়ী শিল্পী কণ্ঠযোজনা করেছেন। জাতীয় সংস্কৃতিতে টাঙ্গাইল জেলার অনেক তারকা ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের অবদানে জাতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। একইভাবে স্থানীয় ক্ষেত্রেও টাঙ্গাইলবাসীর ব্যাপক ভূমিকা ও অবদান সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে অপ্রিয় হলেও সত্য জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত এসব তারকা সম্পর্কে তেমন প্রকাশনা প্রচারণা নেই। ফলে তাদের প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে জেলাবাসী অজ্ঞ। পপ সম্রাট আজম খান ও সুরকার আলম খানের শেকড় যে টাঙ্গাইল জেলার পুণ্যমাটিতে প্রোথিত– এ কথা ক'জন জানে? মূলত এসব অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। জীবনীগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। প্রাথমিক উদ্যোগ বলে অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেলো। আয়ত্ত বহির্ভূত কারণে বাদ পড়ে গেলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারকা জীবনী। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থ আরও সমৃদ্ধ করে প্রকাশে আশা ব্যক্ত করছি।

কুইন ইউসুফজাই

সূচি

প্রবন্ধ

❑ টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি- রাশেদ রহমান---------------------------------------১১
০১. যাদুসম্রাট পি.সি. সরকার-১৯০৬--২৬
০২. অনুপম ঘটক-১৯১১--২৮
০৩. আবুল খায়ের মোহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী-১৯১৭----------------------------২৯
০৪. নিবেদিতা মণ্ডল-১৯২০--৩০
০৫. গোবিন্দ চন্দ্র দে-১৯২১---৩১
০৬. মুজিবুর রহমান খান-১৯২৭---৩৩
০৭. লোকমান হোসেন ফকির-১৯৩৪---৩৬
০৮. মো. হাবিবুর রহমান -১৯৩৫--৩৮
০৯. এফ কবীর চৌধুরী-১৯৩৯---৪০
১০. অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল কাদের-১৯৪২--------------------------------৪১
১১. অমর সিংহ নিয়োগী-১৯৪৪---৪৪
১২. ফারুক কোরেশী-১৯৪৪--৪৬
১৩. আলমগীর খান মেনু- ১৯৪৫---৪৭
১৪. হামিদুল হক মোহন- ১৯৪৬---৫০
১৫. আব্দুর রহমান রক্কু- ১৯৪৭--৫২
১৬. সাযযাদ কাদির-১৯৪৭--৫৩
১৭. খালেকুজ্জামান খান লাবু- ১৯৪৭---৫৫
১৮. এস এম মহসীন-১৯৪৮--৫৬
১৯. মামুনুর রশীদ-১৯৪৮---৬২
২০. বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আম্বিয়া নূরী-১৯৪৮-------------------------------৬৪
২১. আরেফিন বাদল-১৯৪৮---৬৬
২২. দিলওয়ার হাসান- ১৯৫১---৬৮
২৩. বেলায়েত হোসেন খান নান্টু- ১৯৫১--------------------------------------৭২
২৪. এলেন মল্লিক-১৯৫৩---৭৪
২৫. সাজ্জাদ হোসেন খান-১৯৫৩---৭৭
২৬. হারুণ-অর-রশিদ-১৯৫৪---৭৯
২৭. শঙ্কর রায়-১৯৫৫ খ্রি.--৮১
২৮. আমেনা আক্তার (মিনু আনাহলি)- ১৯৫৬--------------------------------৮৩
২৯. বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব- ১৯৫৬----------------৮৫
৩০. সাদেক সিদ্দিকী-১৯৫৬---৯১
৩১. নবকুমার দে- ১৯৫৭---৯৩
৩২. আজিজুল ইসলাম খান স্বাধীন-১৯৫৭--------------------------------------৯৪
৩৩. খালেদ খান-১৯৫৮---৯৫
৩৪. প্রফেসর ডা. রতন চন্দ্র সাহা-১৯৫৮--৯৭
৩৫. আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই (ফাকরী)- ১৯৫৮--------------------১০৬
৩৬. মো. শরীফ উদ্দিন খান দীপু-১৯৫৮-------------------------------- ১০৮
৩৭. সালাম সাকলাইন-১৯৫৯--১০৯
৩৮. আবু হানিফ-১৯৬০--১১১
৩৯. জাকির খান-১৯৬১--১১২
৪০. ইতি নিয়োগী-১৯৬২--১১৫
৪১. আমজাদ কবীর চৌধুরী-১৯৬২-------------------------------------১১৬
৪২. মিতা হক- ১৯৬২--১১৭
৪৩. শহীদুজ্জামান সেলিম-১৯৬৩---------------------------------------১১৯
৪৪. কালীপদ শীল-১৯৬৩-- ১২১
৪৫. আবদুস সালাম-১৯৬৪--১২২
৪৬. এস.এম. আসলাম তালুকদার মান্না- ১৯৬৫-----------------------১২৪
৪৭. অধ্যাপক মো. আবু মনছুর সাদি সালমান-১৯৬৬--------------------১২৭
৪৮. তারানা হালিম-১৯৬৬---১৩০
৪৯. ডিএ তায়েব--১৩২
৫০. উত্তম চক্রবর্তী-১৯৬৭--১৩৪
৫১. নিরঞ্জন বিশ্বাস- ১৯৬৭---১৩৫
৫২. মোহসিনা রহমান-১৯৬৮---১৩৬
৫৩. নূরুল আলম আতিক-১৯৬৯--১৩৮
৫৪. অমিত হাসান-১৯৬৯--১৪০
৫৫. পাপিয়া সেলিম- ১৯৭১---১৪২
৫৬. যাদুশিল্পী এস. এম. মানিক-১৯৭২-------------------------------১৪৫
৫৭. শামসুজ্জামান দারু--১৪৭
৫৮. জাফর আল মামুন-১৯৭২---১৫০
৫৯. ড. পদ্মিনী রায় (রূপালী)-১৯৭৩-----------------------------------১৫১
৬০. মাহবুবা শাহরীন--১৫২
৬১.ছন্দা চক্রবর্তী- ১৯৭৮---১৫৩
৬২. লুৎফর হাসান-১৯৭৯---১৫৪
৬২. আফরান নিশো- ১৯৮০--১৫৬
৬৩. মো. রুহুল আমীন খোকন-১৯৮৩---------------------------------১৫৮
৬৪. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান- ১৯৮৪-------------------------------১৫৯
৬৫. রিয়াজুল রিজু- ১৯৮৫--১৬১
৬৬. বেলাল খান-১৯৮৫---১৬৩
৬৭. লিজু বাউলা--১৬৬
৬৮. খন্দকার ফারহানা রহমান সোমা--------------------------------১৬৮

টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি

রাশেদ রহমান

বদ্বীপ বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপদ– টাঙ্গাইল। এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শাল-গজারির বন। যমুনা-ধলেশ্বরীর উচ্ছল ঢেউয়ের পরশে বেড়ে ওঠে এই জনপদের মানুষ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, রাজনীতি– সব ক্ষেত্রেই টাঙ্গাইলের রয়েছে সুপ্রাচীন-সুবিশাল ঐতিহ্য। টাঙ্গাইলের উর্বর মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু কৃতী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-সাংবাদিক, রাজনীতিক– যাঁদের জন্য গর্বিত এই জনপদ।

ময়মনসিংহ জেলার এক সময়ের মহকুমা, এই টাঙ্গাইল; জেলায় উন্নীত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর। ঠিক এর একশ' বছর পূর্বে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে গোড়াপত্তন হয় টাঙ্গাইল মহকুমার। কোনো-কোনো নৃতত্ত্ববিদ টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলের লালমাটিকে হিমযুগের মাটি হিসেবে অভিহিত করেন। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন টাঙ্গাইল আসাম-কামরূপ জেলার অংশ ছিল। মহাভারত মহাকাব্যে যে বর্ণনা পাওয়া যায়– তাতে মনে হয়, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো টাঙ্গাইলও সম্ভবত সমুদ্রগর্ভে ছিল; যে কারণে আর্যরা এ-অঞ্চলে আসতে পারেনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে তার দরবারে এসেছিলেন; তিনি তাঁর 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের একটি মানচিত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধরাজ্য এবং পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) নির্দেশ করেন। এ থেকেও অনুমান করা যায়, বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চল দীর্ঘদিন কামরূপের অধীনে ছিল।

রাজা হর্ষবর্ধনের সময় (৬০৬-৬৪৭) বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনসাং ভারতে আসেন (৬২৯-৬৪৫)। ছিলেন প্রায় ১৬ বছর। এ সময় তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন; অঞ্চলগুলোতে লক্ষ্য করেন কামরূপের প্রভাব– সম্ভবত প্রাচীন টাঙ্গাইলও তার বাইরে ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে পালবংশ, চন্দ্রবংশ, সেনবংশ ইত্যাদি অংশ বিশেষ বা পূর্ণভাবেই রাজত্ব করে থাকবে– আজকের টাঙ্গাইল অঞ্চলে। বহু উত্থান-পতন ও ভাঙাগড়ার পর গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২) ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এটি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্দশ শতকের গোড়া থেকেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা টাঙ্গাইল অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রভাব বিস্তার করে। এরপর কখনো ইলিয়াস শাহী, হুসেন শাহী, সুর বংশ, কখনো কররানী, পরে মুঘল এবং অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদকুলি খাঁ, নবাব আলীবর্দী খাঁ, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা; ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পর বৃটিশ-বেনিয়ারা দখল করে এ-ভূখণ্ড। এরপর ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান-পূর্বপাকিস্তান এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। টাঙ্গাইল, এখন বাংলাদেশের একটি জেলা– উর্বর জনপদ।

আমরা, এই নিবন্ধে টাঙ্গাইল অঞ্চলের সংস্কৃতিকথা বলবো; কিন্তু আপনারা সবাই কবুল করবেন আশা করি– একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গেলে তার ইতিহাসও কিছুটা জানা অপরিহার্য। ইতিহাস ব্যতীত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না। তাই এতক্ষণ, ধান ভানতে সামান্য শিবের গীত...।

টাঙ্গাইল অঞ্চলের সংস্কৃতিকথা আমরা বলবো; চেষ্টা করবো টাঙ্গাইলের সংস্কৃতির রূপ নিরূপণের; তার আগে দেখে নেয়া যাক– আসলে, সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি। সংস্কৃতির স্বরূপ আমাদের কাছে কীভাবে ধরা দেয়; কীভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

'সংস্কৃতি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ– সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ; কৃষ্টি ইত্যাদি। আমরা যখন 'টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি'র স্বরূপ খুঁজবো, তখন 'সংস্কৃতি'র আভিধানিক এই অর্থগুলো কীভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ করবে। আমরা চারদিকে দেখছি, 'সংস্কৃতি' শব্দটি অন্য একটি শব্দের পরে বসে নতুন অর্থের সৃষ্টি করে নতুন শব্দ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। যেমন– জনসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, নন্দন-সংস্কৃতি, শিল্পসংস্কৃতি, রাজনৈতিক-সংস্কৃতি, ধর্মীয়-সংস্কৃতি ইত্যাদি।

তাহলে, আমরা, টাঙ্গাইলের কোন সংস্কৃতির অন্বেষণে নামবো? প্রকৃত কথা হচ্ছে– 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ অভিধানের সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। 'সমাজ ব্যবস্থা' অর্থেও ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতি শব্দটি এবং বলাবাহুল্য– এটিই প্রকৃত অর্থ। সুতরাং বলা যায়, একটি এলাকার সংস্কৃতি বলতে বুঝায় ওই এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচার, অনুষ্ঠানাদি, পালা-পার্বণ, স্বভাব, অভ্যাস, পছন্দ, ভাষা, সাহিত্য-সঙ্গীত, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবনপদ্ধতি। টাঙ্গাইলের সংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে আমাদের এসবই খুঁজতে হবে।

জনসংস্কৃতি

চীনা পরিব্রাজক হিউএনসাং (৬৩৫ অব্দ) আলাপসিং (মধুপুর, ঘাটাইল ও সখীপুরের পাহাড়িয়া এলাকা) এর দক্ষিণ অঞ্চলকে সারাবছর জলমগ্ন দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো-কোনো জায়গায় দেওপাড়া পাহাড় থেকে বর্তমান বগুড়া পর্যন্ত গুদারা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ টাঙ্গাইলের ভর অঞ্চলে স্থায়ী জনপদ গড়ে ওঠার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। লালমাটি ব্যতীত টাঙ্গাইলের সমতল অঞ্চলের কোথাও দ্বাদশ শতাব্দীর আগের জনপদের কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ মধুপুর গড় অঞ্চলে প্রথম জনপদ গড়ে ওঠে। কিন্তু মধুপুরে বসবাসকারী উপজাতিরাই (গারো, মান্দাই, রাজবংশী ইত্যাদি) এখানকার আদিবাসী কিনা তার কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

গারো-মান্দাইরা আদিবাসী হোক বা না হোক; গারোদের সংস্কৃতি অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির অধিকার লাভ করে কন্যা সন্তান। মধুপুরে গারোদের মধ্যে দু'টি নিজস্ব ভাষা প্রচলিত– একটি 'মান্দি কুচিক', অপরটি 'আচিক কুচিক'। গারোদের ঈশ্বরের নাম– 'তাতারা রাবুগা'। তাদের মৃতদেহ পোড়ানো হয়। গারো

সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য দিক হচ্ছে তাদের বিভিন্ন উৎসব, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নান্দনিক নৃত্যগীতের আয়োজন। গারোদের সবচে' বড় উৎসব– ওয়ানগালা।

গারো সমাজে এখনো আদি 'সাংসারেক' ধর্ম প্রচলিত আছে; তবে বহু গারো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।

মদ গারোদের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। জন্ম থেকে মৃত্যু; পূজা-পার্বণ-উৎসব সর্বত্র রয়েছে মদের ব্যবহার। ওরা নিজেরাই মদ তৈরি করে। গারোদের তৈরি মদকে 'পচাই' বা 'চু' বলা হয়। মদ তৈরি করতে গিয়ে ঘরের সব চাল শেষ করে ফেলে, তারপর না খেয়ে থাকে; আছে এরকম উদাহরণও। শিশুর জন্মের সাথে-সাথে তার মুখে দেয়া হয় বিশেষভাবে তৈরি মদ। মৃত্যুর পর শবদেহ স্নান করানো হয় মদ দিয়ে।

টাঙ্গাইলে, এই কিছুসংখ্যক উপজাতিকে বাদ দিলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। সংখ্যাগুরু অংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোথাও আছে বা ছিল– এমন কোন প্রমাণ মেলেনি। জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু অংশ মুসলিম হওয়ায় ইসলামী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি টাঙ্গাইলের ভূমিজ সংস্কৃতিকে দখল করে বসেছে। সখীপুরের গড়বাড়ির 'বখতিয়ার খাঁর দীঘি'র ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য থেকে পাওয়া শিলালিপি প্রমাণ করে যে, দ্বাদশ শতকেই টাঙ্গাইল অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছিল।

টাঙ্গাইলে গরুর গোসত আর পাঁঠার মাংস, বলি আর জবেহ ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের খাদ্যাভাসে তেমন পার্থক্য নেই। রন্ধনসংস্কৃতিতে অতীতে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এখন তেমনটা দেখা যায় না। পোশাক-আশাকেও এখন তেমন পার্থক্য নেই। প্যান্ট-শার্ট, লুঙ্গি-গেঞ্জি সবাই ব্যবহার করে। বিয়ের রীতিতেও মৌলিক পার্থক্য নেই। মওলানা এবং পুরোহিত ডেকে উভয় সম্প্রদায়ে বিয়ে সম্পাদিত হয়। যার যার ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও শ্রাদ্ধ, পইতা, চেহলাম, চল্লিশা, ব্রাহ্মণভোজন, মুনশিভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

অতিথি আপ্যায়নের একটি বিরল ঐতিহ্য রয়েছে টাঙ্গাইলের জনসংস্কৃতিতে। কিছুকাল আগেও পানি পিপাসায় কোনো পথিক, হিন্দু-মুসলমান যে কারো বাড়িতে পানি খেতে চাইলে; অন্তত 'কদমা' বা গুড় দ্বারা আপ্যায়িত করা হতো। শুধু পানি খেতে দেয়া হতো না। অতিথি সৎকার বা মেহমানদারিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বরকত বা লক্ষ্মীর আগমন হিসেবে বিবেচনা করতো মানুষ।

টাঙ্গাইলের জনসংস্কৃতির বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে 'গাঁওয়ালা' দাওয়াত বা জিয়াফতের আয়োজন। সমাজের বিত্তবান শ্রেণি শ্রাদ্ধ বা পইতা, চল্লিশা, কন্যা-পুত্রের বিয়ে, পুত্রের মুসলমানি, অন্নপ্রাশন, হাতেখড়ি ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবে এই 'গাঁওয়ালা' দাওয়াত বা জিয়াফতের আয়োজন করে। এ-আয়োজনে দাওয়াত দেয়া হয় গ্রামের সব লোককে। হিন্দু-মুসলমানের জন্য করা হয় খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা।

এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার টমটম, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ডুলি-পালকি টাঙ্গাইলের জনসংস্কৃতির বর্ণাঢ্য অংশ। গরুর গাড়ি-ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার কোনো-কোনো এলাকায় সামান্য টিকে আছে। ডুলি-পালকি এখন ইতিহাস। চল্লিশের দশকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এবং পঞ্চাশের দশকে টাঙ্গাইল-ঢাকা সড়কে মোটরগাড়ির প্রচলন 'টমটম'-এর প্রসার সংকুচিত করে ফেলে। ষাটের দশকে রিকশা প্রচলনের পর হারিয়ে যায় টমটম।

নৌকাবাইচ, ষাঁড়লড়াই, ঘোড়দৌড়, মইদৌড়, লাঠিখেলা, হা-ডু-ডু খেলা, পুঁথিপাঠ ইত্যাদি টাঙ্গাইলের জনসংস্কৃতিকে ভাস্বর করে রেখেছে। হা-ডু-ডু বা গুডুগুডু খেলায় টাঙ্গাইলের মর্যাদা দেশসেরা।

লোকসংস্কৃতি

টাঙ্গাইলের লোকসংস্কৃতির রয়েছে বিশাল ভাণ্ডার; এর নিজস্ব সত্তাও রয়েছে। যাত্রাপালা, সংযাত্রা, জারি-ধুয়া-ঘাটুগীত, পালা-পার্বণ, মেলা ইত্যাদি টাঙ্গাইলের লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল অংশ।

যাত্রাপালা

আধুনিক থিয়েটার প্রচলনের আগে টাঙ্গাইল অঞ্চলে যাত্রাপালাই ছিল অভিনয়কলা ও অভিজাত শ্রেণির বিনোদনের একমাত্র নান্দনিক সংস্কৃতি। তবে কবে কোথায় প্রথম যাত্রাপালার আয়োজন– এ ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। নানা জনশ্রুতি থেকে প্রতীয়মান হয়– টাঙ্গাইলের প্রায় প্রত্যেক (বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের) রাজা-জমিদার বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে তাদের বাড়ির নাট্যমন্দির কিংবা বাড়ির আঙিনায় যাত্রাপালার আয়োজন করতেন। হেমনগর, মহেড়া, পাকুল্লা, সন্তোষ ও নাগরপুরের জমিদারবাড়িতে যাত্রাপালার আয়োজন করা হতো প্রায় নিয়মিত– এরকম জনশ্রুতি রয়েছে। কালিহাতির সয়া, ভূঞাপুরের নিকরাইল, গোপালপুরের মাহমুদনগর, দেলদুয়ারের এলাসিন ও রূপসী, টাঙ্গাইল সদরের পোড়াবাড়ি, শিবপুর ও ঘারিন্দায় গড়ে উঠেছিল শৌখিন যাত্রাদল।

বিংশ শতাব্দীতে টাঙ্গাইল অঞ্চলে যাত্রাভিনয় করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন অনেকে; তাদের মধ্যে টাঙ্গাইল সদরের বোয়ালির বাঁশি মিয়া ও রমজান আলী, কালীপুরের বিনোদ সাহা, সাকরাইলের অনন্ত সেন, করটিয়ার ঠাকুরদাস পাল ও নিমাই শীল, সন্তোষ পালপাড়ার বাদল পাল, রামপাল ও গোপাল কর, পোড়াবাড়ির মুসলিম মিয়া, আকুরটাকুরের অনিল বাগচী ও সুনীল বাগচী, পলাশতলীর হিমাংশু কুমার ভৌমিক, বিশ্বাস বেতকার কার্তিকচন্দ্র শীল ও ননী সূত্রধর, শিবপুরের শিশির ভৌমিক, অলোয়ার শান্তিরাম শীল, বিজয় বসাক, সুখলাল দাস, জীবন সরকার, পোড়াবাড়ির মতিলাল গৌড়, ভূঞাপুরের নিকলার সুকুমার রায়, বাসাইলের কাঞ্চনপুরের সিরাজুল ইসলাম খান মালা, নাগরপুরের ব্যাকসার গ্রামের অনীল দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তখন, যাত্রাপালায় পুরুষেরাই নারী-চরিত্রে অভিনয় করতেন। চানমোহন দাস (আলেয়া, সিরাজ-উদ-দৌলা), অলোয়ার জগদীশ রজক, বীরেন্দ্রকুমার সাহা,

করটিয়ার খাজা, ঘারিন্দার কার্তিক বসাক, কার্তিক শীল ও কালীবাড়ি পাড়ার অবিনাশ দাশ নারী চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সত্তর-আশির দশকেও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন গ্রামে কেরোসিনের হ্যাজাক কিংবা ডে-লাইট জ্বালিয়ে, 'বাদাম' টাঙিয়ে বসতো যাত্রার আসর। দুর্গাপূজা কিংবা ঈদে আয়োজিত যাত্রাপালা রাতভর উপভোগ করতো দর্শকরা।

সঙযাত্রা

'সঙ' অদ্ভুত ঢঙের এক অভিনয়কলা। লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ এ-অংশটি টাঙ্গাইলে সঙযাত্রা বা সঙখেলা হিসেবে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সবিশেষ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে; সঙযাত্রা তেমনি টাঙ্গাইলের ঐতিহ্য। আদিরস মিশ্রিত হাস্য-কৌতুকধর্মী অভিনয়কলাই টাঙ্গাইলে 'সঙযাত্রা' হিসেবে পরিচিত।

টাঙ্গাইলে কবে থেকে 'সঙযাত্রা'র প্রচলন হয়েছে– তার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনো-কোনো গবেষক মনে করেন, অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছুকাল পর বিভিন্ন স্থানে 'সঙযাত্রা'র উদ্ভব ঘটে; একই সাথে উদ্ভব ঘটে টাঙ্গাইলেও। এ-সময় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী পুরো ভারতে শাসনের নামে শোষণ-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায় সাধারণ মানুষের ওপর। কিন্তু এর প্রতিবাদের কোনো উপায় ছিল না। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' এবং মীর মশাররফ হোসেন জমিদার দর্পণ নাটকের মাধ্যমে ইংরেজদের নির্যাতনের কিছুটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলেও এ-প্রয়াস ছিল সীমিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। নীলদর্পণের আবেদন সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগানোর আগেই বৃটিশ সরকার এ-নাটক মুদ্রণ, প্রচার ও মঞ্চায়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তখন সাধারণ মানুষ ইংরেজদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে নিজেরাই 'সঙ' এর সৃষ্টি করে। অর্থাৎ 'সঙ' প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে সঙযাত্রার উদ্ভব যে কারণে, যেভাবেই ঘটুক না কেন, পুরো ভারতে বা বাংলাদেশের আর কোথাও সঙযাত্রা টিকে না থাকলেও টাঙ্গাইলে এখনো সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী ধারা হিসেবে সামান্য কিছু টিকে আছে। একসময় টাঙ্গাইলের প্রায় সব গ্রামেই সঙযাত্রার দল ছিল, আজ তেমনটি নেই। তারপরও টাঙ্গাইল সদরের বড় বাসালিয়া, রসুলপুর, দাইন্যা, দেলদুয়ারের পাথরাইল, বাসাইলের বাথুলী, মির্জাপুরের শেহরাইল সঙযাত্রা দলের সুনাম ছড়িয়ে আছে প্রায় দেশ জুড়ে।

পূজা-পার্বণ বা কোনো উৎসবে মন্দির প্রাঙ্গণ কিংবা বড়বাড়ির উঠোনে বসে সঙযাত্রার আসর। প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় কোনো খোলা জায়গায় বা খেলার মাঠে। কোনো সঙযাত্রার দলেই সাধারণত লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখা যায় না। দলের ম্যানেজার বা প্রশিক্ষক প্রস্তুতিপর্বে শিল্পীদের নিয়ে বসে নিজেরাই কাহিনি ও সংলাপ তৈরি করেন। সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গ ও আদিরস মিশিয়ে তৈরি করা হয় একেকটি সঙ-কাহিনী।

বন্দনা ও পরিচয়গীত প্রত্যেক সঙযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুর সঙযাত্রা দলের নাম 'বীণাপাণি', তাদের দলের পরিচয়গীত নিম্নরূপ–

'ভালো রসুলপুর গ্রামে
বীণাপাণি নামে
সঙযাত্রা গান।
এই দলেরই ম্যানেজার আছে
পাগলা মালি নাম।
এই দলেরই ওস্তাদ আছে
হরিপদ বাবু নাম।
এই দলের একনম্বর জোকার
লালচান মিয়া নাম।

জারি

'জারি' ফার্সি শব্দ; অর্থ– ক্রন্দন বা বিলাপ। 'জারি' শব্দের আভিধানিক অর্থ থেকে ধারণা করা যায়– এটি একধরনের করুণ-রসাত্মক গান। বিলাপ ও বিষাদ এ গানের মূল উপাদান।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে যে জারিগান গীত হয় বা হতো– এসব গানে 'জারি' বলতে শুধু ক্রন্দন বুঝায় না, এমন এক শ্রেণির গান বুঝায়, যা– গীতিকা ধরনের। এ-গান অত্যন্ত দীর্ঘ, একই ছন্দে রচিত এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিবেশিত হয়।

জারিগানের মূল গায়েনকে বলা হয় 'বয়াতি'। এছাড়া থাকে 'দোহার'। সব দোহারকে একত্রে বলা হয় 'পাল দোহার' বা 'পাইল দোহার'।

বাড়ির উঠোন বা বারবাড়িতে খড়-পাটি-ছালা প্রভৃতি বিছিয়ে কিংবা মঞ্চ তৈরি করেও জারিগান পরিবেশন করা হয়। জারিগানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খঞ্জুরি, জুরি, খোল, করতাল বেশি ব্যবহৃত হয়। বয়াতি আসর বন্দনা করে গান পরিবেশন করেন।

ধর্মীয় কাহিনি, সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়াদি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ– যেমন-ঝড়, বন্যা ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় জারিগান। হাস্যরসাত্মক-ব্যঙ্গাত্মক, কিংবা প্রেমের কাহিনিও জারিগানে ছন্দাকারে স্থান পায়। জারিগানের পয়ারের মধ্যেই রচয়িতার নাম, রচনার দিন-তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের বামনহাটা গ্রামের বাহাদুর আলী খান ও গাবসারা রামপুর গ্রামের কাশেম আলী রচিত জারিগানের এখনো সন্ধান পাওয়া যায়।

বাহাদুর আলী খান রচিত একটি জারিগানের অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছি–

'শোনো ত্যারোশো একষট্টি সনে

ওরে দুর্ঘটনা পাকিস্তানে

হায়রে চাষা বুদ্ধিনাশা
বুক ভেসে যায়।
পরথোম আষাঢ় মাসে আইলো বান
খাইয়া গেল চরার ধান
কী খাইয়া বাঁচবো প্রাণ
বাঁচি না চিন্তায় ....
তাই বলছে অধম বাহাদুর খাঁ
চতুর্দিক দেখি বাঁকা
পৃথিবীটা গাড়ির চাকা
ঘোরে সব সময়।
হায়রে চাষা বুদ্ধিনাশা
বুক ভেসে যায়।'

ধুয়া

টাঙ্গাইলের লোকসংস্কৃতির একটি শক্তিশালী শাখা– ধুয়া গান। জেলার সর্বত্রই ধুয়াগান খুব জনপ্রিয়। তবে টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার, ভূঞাপুর ও মির্জাপুরের পশ্চিমাঞ্চলে ধুয়া গানের প্রচলন বেশি।

'ধুয়া' শব্দটি সংস্কৃত 'ধ্রুব' শব্দ থেকে এসেছে। 'ধ্রুব'-এর আভিধানিক অর্থ স্থির বা অচঞ্চল। গানের যে অংশ স্থির থাকে অর্থাৎ বারবার গাওয়া হয় তাই ধুয়া।

ধুয়াগান মূলত মৌসুমি গান। কৃষকরা এই গানের গায়ক ও শ্রোতা। ধুয়াগান দীর্ঘ প্রকৃতির। এই গানের তাল-ছন্দ-লয় লম্বা। কৃষকরা দরাজকণ্ঠে ক্ষেতখোলা মুখরিত করে গায় ধুয়াগান। ধুয়াগানের বয়াতি প্রথম স্তবক গাওয়ার সাথে-সাথে দোহাররা বয়াতির সাথে সুর মিলিয়ে গান ধরে। গানের প্রথম স্তবক শেষ হলে অন্তরা হিসেবে আবার প্রথম স্তবক গাওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তবক গাওয়া শেষ হলে আবারও গাওয়া হয় প্রথম স্তবক। এভাবে গানের শেষ স্তবক একটার পর একটা চলতে থাকে।

ধুয়াগানে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, বিচার, গুরুতত্ত্ব, প্রেম, কারবালা বিষয়ক নানা উপাদান থাকলেও এটা মূলত শ্রমসঙ্গীত। বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত মাঠে কাজ করার সময় রোদের তীব্রতা ভুলে থাকার জন্য কৃষকরা ধুয়াগান গায়। বিশেষ করে ধানক্ষেতে 'দুনা' দেয়া বা পাটক্ষেতে 'টানাবাছ' দেয়া কিংবা 'গাতায়' কাজ করার সময় কৃষকের কণ্ঠে ধুয়াগান শোনা যায়। বাড়িতেও বসে ধুয়াগানের আসর।

ধুয়াগানের একটি অংশ 'সারিগান' হিসেবে পরিচিত।

ঘাটুগীত

'ঘাটুগীত' টাঙ্গাইলের লোকসংকৃতির একটি বিশেষ উপাদান। কোনো-কোনো লোকসংস্কৃতি গবেষক দাবি করেন 'ঘাটুগীত'-এর জন্ম ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলাকায়। তবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

একসময় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল নৌপথ। নদীর ঘাটই ছিল মানুষের সম্মিলনের প্রধান স্থান। আর ঘাটেঘাটে এ গীত-ধারা পরিবেশনের প্রচলন ছিল বলেই

এর নাম 'ঘাটুগীত' হয়েছে বলে মনে করেন কোনো কোনো গবেষক। ঘাটুগীতে মূলত রাধা-কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যান বর্ণনা করা হয়।

টাঙ্গাইলের লোকসংস্কৃতি, বিশেষ করে লোকসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী, যেগুলোয় এ-অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও জীবনবোধ খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো শুধু টাঙ্গাইলের গৌরবই বৃদ্ধি করেনি– বাংলাভাষার লোকসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে।

যে-সব শিল্পী-বয়াতি টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন– আজ তাদের কারো ঠিকুজি খুঁজে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি থেকে দু'একটি নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। এরকম একটি নাম– অনিল শীল। টাঙ্গাইলের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোনো এক গ্রামে নাকি তাঁর বাড়ি ছিল। শোনা যায়, কালিহাতির রামপুর গ্রামে শ্যামা ঘোষ ও রামা ঘোষ নামে দুই বিখ্যাত বয়াতি-কবিয়াল বসবাস করতেন। তাদের কোনো একজনের বিখ্যাত স্থূলরসের একটি গান–

'ও নাগর!
নিহরে ভিজিলরে শাড়ি
গামছা কেন বিছাইলি না?'

এ-গানটি এখনও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের যে-গায়েনের নাম টাঙ্গাইলবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে– তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল শহরের সন্নিকটে বেরাবুচনা নিবাসী 'মিয়াউল্লাহ।' এই গুণী-গায়েনের যোগ্য শিষ্য ছিলেন একই গ্রামের 'নিশান বয়াতি।' নিশান বয়াতি পুরো এক শতাব্দীকাল তাঁর কণ্ঠমাধুর্য দিয়ে এ-অঞ্চলের মানুষকে বিমোহিত করে রেখেছিলেন।

নিশান বয়াতি ছাড়াও বেথইর গ্রামের আবদুর রহমান বয়াতি, গোসাই জোয়াইরের কবিয়াল বঙ্কু গোসাই, নাগরপুরের তোরাব আলী বয়াতি টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের খ্যাতি প্রসারিত ছিল সারাদেশে। এদের অনুসারী মধুপুরের কবিয়াল ননী গোপাল, শচীন বর্মণ, পাথরাইলের সুনীল বয়াতি, ঘাটাইলের শামসুল আলম আদি টাঙ্গাইলের সিরাজ বয়াতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলে বেশকিছু স্বনামধন্য কীর্তনিয়া ছিলেন, যাঁরা নামকীর্তন করে বেড়াতেন; কখনো কখনো নামকীর্তন অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন– নাগরপুরের জীবন চক্রবর্তী এ ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

ভাড়াভুড়া, গাস্যি, পষুরা, শাওইনা ডালা, অষ্টমীস্নান, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, গোষ্ঠমেলা, আশুরা, ঈদ্যোৎসব ইত্যাদি টাঙ্গাইলের লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল অংশ।

বিভিন্ন সংক্রান্তিতে টাঙ্গাইলের বিভিন্নস্থানে বৈশাখী মেলাসহ নানা ধরনের মেলা বসে। এগুলোও লোকসংস্কৃতির বৈভব। এসব মেলার মধ্যে মধুপুরের আউশনারার বউমেলা, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুরের জামাইমেলা, ব্রাহ্মণকুশিয়ার ভূতের মেলা, আগবেথইরের রাধাচক্করের মেলা, গালার চড়কমেলা, পাছবেথইর-সন্তোষ-করটিয়া-

মগড়ার রথযাত্রামেলা, গাড়াইলের অষ্টমীস্নান মেলা, মধুপুরের রসুলপুর, গোপালপুরের কাঙালদাশপাড়া, ভূঞাপুরের ফলদা ও কয়রার গোষ্ঠমেলা, সখীপুরের দাড়িয়াপুরের ফাইলা পাগলার মেলা, টাঙ্গাইল শহরের সাবালিয়ার হরি পাগলের মেলা, আকুরটাকুরের মদনার মা'র মেলা উল্লেখযোগ্য।

নন্দন-সংস্কৃতি

সাধারণভাবে 'সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক' ইত্যাদিকে 'নন্দন-সংস্কৃতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতির এই ধারাটিও টাঙ্গাইলে অত্যন্ত ভাস্বর ।

সঙ্গীত

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকায় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। টাঙ্গাইল সদরের শিবপুর ভূঁইয়াবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিলেন ধীরেন ভৌমিক; যিনি পরবর্তী সঙ্গীত-সাধনায় গৌরীপুরের মহারাজার আনুকূল্য লাভ করেন। সন্তোষের মহারাজার সহযোগিতায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী রমেশ মজুমদার খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন।

টাঙ্গাইলের মেয়ে নিবেদিতা মণ্ডল (পূর্ব নাম নিবেদিতা সেন) উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত টপ্পাশিল্পী ছিলেন। এইচএমভি, কলম্বিয়া, হিন্দুস্থান রেকর্ড তাঁর একাধিক রেকর্ড বাজারজাত করেছিল।

মোশারফ হোসেন খানশূর ছিলেন বাংলার গজলসম্রাট। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে কুমুদিনী কলেজের হেডক্লার্ক আব্দুল খালেক খান উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গণেশ কর্মকার ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত খোলবাদক। নগেন চ্যাটার্জি, অপরেশ চক্রবর্তী, নার্গিস হামিদ, সত্যেন ব্যানার্জি, দীপ্তি চক্রবর্তী, খোদেজা বেগম, রতন চ্যাটার্জি প্রমুখ সেতারে খ্যাতিমান ছিলেন।

বংশীবাদনে টাঙ্গাইলের স্থান সুপ্রাচীনকাল থেকেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। অন্ধ কানাইয়ের নাম পাওয়া যায় বিভিন্নজনের রচনায়; যিনি বিখ্যাত বংশীবাদক ঈমান আলীর পূর্বসুরি ছিলেন। ঈমান আলীর উত্তরসুরি আবদুল ওয়াহেদ, আবদুল ওয়াহেদের উত্তরসুরি ছানোয়ার হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, অন্ধ সোনা মিঞা, দিলীপ চক্রবর্তী, ইকবাল হোসেন প্রমুখ বংশীবাদক টাঙ্গাইলের গর্ব। খোল-তবলা-বেহালায়ও ছিলেন, আছেন অনেক গুণীশিল্পী।

শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, আধুনিক-রবীন্দ্র-নজরুল ও পল্লীসঙ্গীতে খ্যাতিমান ছিলেন, পঞ্চাশের দশকের আগে সুধীরকান্ত মৈত্র, হরচন্দ্র চক্রবর্তী, পদা ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, রামা ধোপা, নাগরপুরের মুরারী মোহন গোস্বামী, খুররম খান পন্নী, ভানু সিদ্দিকী, লুৎফর রহমান খান, নূরুল ইসলাম, স্বদেশ প্রিয় ঘোষ, পাথরাইলের শ্যামা চক্রবর্তী, দেওলার রবীন্দ্রনাথ সরকার, ভূঞাপুরের ক্ষেত্রমোহন বসাক; পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্বপন মণ্ডল, তারাপদ দে, চানমোহন দাশ (চানু দাস), রতন অধিকারী, অঞ্জলি অধিকারী, রতন চক্রবর্তী, মুস্তাফিজ আনোয়ার, এছাক আলী, শিলা ঘটক, তৃপ্তি চক্রবর্তী, সুপ্তি চক্রবর্তী (পরিবর্তিত নাম পারভীন বেগম), নীলুফার পান্না, করুণাকিঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকে নাজলি বেগম,

শামসুজ্জামান দারু, ইজ্জত আলী, শিলা বসাক, সুরাইয়া আক্তার বকুল, সুফিয়া আক্তার ডোরা প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ের প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী এলেন মল্লিক। আশির দশক থেকে যারা টাঙ্গাইলের সঙ্গীতাঙ্গন মুখর রেখেছেন তাদের মধ্যে ইবরাহীম হোসেন, আলমগীর হোসেন, সুফিয়া খাতুন, সাবেরা সুলতানা, পাপিয়া বিশ্বাস, নন্দিনী বিশ্বাস, কঙ্কন, লাকি, লায়লা খানম, আব্দুল কদ্দুস, আল্পনা বসাক, পল্লব খন্দকার, শিবাজী দে, রূপালী দে, ফিরোজ আহমেদ বাচ্চু, নাসরীন পাশা অন্যা, তাজিন শহীদ টিনা, পলি গুহ, দিশা সাহা, ফারজানা পারভীন রণি, উম্মে কুলসুম উর্মি, শামসুননাহার কেয়া, কেয়া রহমান উষা, সালমা সালাম ঊমি, সিঞ্জন, রিতা কর্মকার, শান্তা পাল, মৌমিতা বিশ্বাস, বৃষ্টি কর্মকার, শামীম আল মামুন শামীম, সুমন আহমেদ, আজহারুল ইসলাম তপু, রাশেদা আক্তার কলি, ইমু আক্তার, দীপা সরকার, নিশা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া, টাঙ্গাইলের সঙ্গীতাঙ্গনের বেশকিছু শিল্পী জাতীয় পর্যায়ে বেতার-টিভি, শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন; গৌরব বৃদ্ধি করেছেন টাঙ্গাইলের। এরা সবাই টাঙ্গাইল শহরের বাসিন্দা। এদের মধ্যে থানাপাড়ার সুফিয়া আক্তার ডোরা, ছন্দা চক্রবর্তী ও সাবেরা সুলতানা, আকুরটাকুরের বকুল ও তাজিন শহীদ টিনা, ফৌজদারিপাড়ার নাসরিন পাশা অন্যা, ভিক্টোরিয়া রোডের মৈত্রী মিত্র, আদালতপাড়ার তাহমিনা খান মিতু ও আতিয়া আফরিন শশী, বিশ্বাস বেতকার ফারজানা হোসেন এ্যানি, সাবালিয়ার তিলাঞ্জন রায়চৌধুরী, দেওলার সুবর্ণা রহমান কেকার নাম উল্লেখযোগ্য।

হাল আমলে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেশব্যাপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ করছে। এই উদ্যোগে টাঙ্গাইলে প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন মনির হোসেন, মনোয়ারা মনা, রিফাত পারভীন হৃদয়, নিলয়, সুমন আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাপি, আনিকা খান মজলিস, মির্জাপুরের তাথৈ, এলেঙ্গার পপি প্রমুখ।

টাঙ্গাইলে বিভিন্ন সংগঠন সংস্কৃতিচর্চা, পরিচর্যা ও বিকাশে ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে আব্বাসউদ্দীন সঙ্গীত বিদ্যালয়, সত্যেন সেন সঙ্গীত বিদ্যালয়, উদীচী, সপ্তসুর, শতদল সংস্কৃতিক সংস্থা, টাঙ্গাইল ক্লাব, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, নাট্যবিতান, সরগম, স্বকাল পরিষদ, সঙ্গীত নিকেতন, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, সপ্তসুর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ষড়জ পঞ্চম, নজরুল সাহিত্য পরিষদ, স্বরলিপি সঙ্গীত একাডেমি, নিবেদিতা সঙ্গীত একাডেমি, টাঙ্গাইল সঙ্গীত একাডেমি, শতসুর সঙ্গীত একাডেমি, শতগান সঙ্গীত একাডেমি, সারগাম ললিতকলা একাডেমি, চারুপিঠ ললিতকলা একাডেমি উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইলের সন্তান অকালপ্রয়াত দীপক মৈত্রের রেকর্ডকৃত গান সারাদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

ভূঞাপুরের নিকরাইলের লোকমান হোসেন ফকির একাধারে গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালনা করে খ্যতিমান হয়েছিলেন। তাঁর লেখা–

‘রূপালি নদী যেথা বয় আঁকা-বাঁকা-বাঁকা
সোনালি ধানের শীষে যার প্রান্তর ঢাকা
আকাশ বাতাস বয় শেফালির নীল
সোনার এই বাংলাদেশের জেলা টাঙ্গাইল’ – গানটি টাঙ্গাইল-সঙ্গীত হিসেবে গীত হয়।

আব্দুল লতিফ রচিত–

‘মহীয়সী টাঙ্গাইল, গরিয়সী টাঙ্গাইল
সালাম জানাই তোমায়’– গানটিও টাঙ্গাইল-সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়।

আব্দুল লতিফেরই রচনা –

‘নদী-চর, খাল-বিল গজারীর বন
টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন।’

নিকরাইলের ‘ফকির’ পরিবারের সালাম পারভেজ ফকিরও উল্লেখযোগ্য গীতিকার ও সুরকার।

পঞ্চাশের দশকে টাঙ্গাইলের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আসগর খান প্রতিষ্ঠা করেন সাংস্কৃতিক সংগঠন– ‘আর্ট সেন্টার।’ এটি টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি অঙ্গনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া প্রগতি মজলিশ, পূর্বাচল সংস্থা, শহীদ সালাউদ্দিন ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

নৃত্য

টাঙ্গাইলের নৃত্যকলার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। নৃত্যকলার সিকি শতাব্দীর (আনুমানিক) যে-ইতিহাস পাওয়া যায় সেখানেও কোনো নারী-নৃত্যশিল্পীর নাম নেই। সেই সময়ে রক্ষণশীল সমাজ কোনো নারীকে জনসমক্ষে নৃত্য পরিবেশনের অনুমতি দেয়নি। এমন কী হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-অর্চনা-আরতিতেও নাচতে পারতো না মেয়েরা। তারপরও টাঙ্গাইলের নৃতাঙ্গনের রয়েছে বর্ণাঢ্য অতীত।

চল্লিশের দশকের আগে, টাঙ্গাইল শহরের থানাপাড়ার ভুবনেশ্বর ব্রেণ্ডা বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ছিলেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত নর্তক উদয়শঙ্করের স্নেহধন্য শিষ্য ছিলেন তিনি। এ সময় টাঙ্গাইলের বিভিন্ন যাত্রামঞ্চে পদা ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন বসাক, কার্তিক বসাক, চানমোহন দাস প্রমুখ নত্য পরিবেশন করতেন।

কোনো-কোনো সংস্কৃতি গবেষক মনে করেন, টাঙ্গাইলে মেয়েরা সর্বপ্রথম নৃত্যমঞ্চে আবির্ভূত হন রণদাপ্রসাদ সাহা (আরপি সাহা) প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী কলেজে। কেউ-কেউ বলেন মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের অভ্যন্তরে দুর্গাপূজায় প্রথম মেয়েদের সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। আবার কারো-কারো মতে, এর অনেক আগেই, সন্তোষের গঙ্গামন্দিরে মেয়েদের নাচের প্রচলন ছিল। এখানে মন্দিরের সেবাদাসীরা নাচতেন।

সর্বপ্রথম, টাঙ্গাইলে যে নারী নৃত্যশিল্পী হিসেবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন; তিনি টাঙ্গাইলের নিয়োগী পরিবারের মেয়ে– অনিতা নিয়োগী (পরবর্তী নাম অনিতা গুহ,

লুকোচুরি ছায়াছবির নায়িকা)। পরবর্তীকালে নৃত্যশিল্পী হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– শোভা দেব, রাজলক্ষ্মী ভট্টাচার্য, কাজল দাস, অঞ্জলি চক্রবর্তী, তৃপ্তি নিয়োগী, দরিয়া ইউসুফজাই, খোদেজা বেগম প্রমুখ।

১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহের মেয়ে ঝর্ণা বসাক (পরবর্তীতে বিখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা শবনম) টাঙ্গাইলে সিডিসি'র ‘উল্কা’ নাটকে নৃত্য পরিবেশন (নাটকের মঞ্চে মেয়েদের প্রথম নৃত্য পরিবেশন) করেন। নিবেদিতা মণ্ডল ও অপরেশ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় টাঙ্গাইলে এটি সর্বপ্রথম ব্যাকরণসিদ্ধ নৃত্য পরিবেশন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শহীদ সালাউদ্দিন ক্লাব সিডিসি রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম নারী-পুরুষের সমন্বয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। একই সংগঠন ৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৩৫৫জন শিল্পী সমন্বয়ে টাঙ্গাইলের মাটিতে সর্বপ্রথম মুক্তমাঠে জেলার বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান ও আবহমান বাংলার সংস্কৃতির নৃত্যরূপ পরিবেশন করে– যা টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি অঙ্গনের উজ্জ্বল ইতিহাস।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দিলু খন্দকার, বেবী, মেরী, ইতি, বকুল, শাহীন তালুকদার, হারুনুর রশীদ খান, লিপি, রানু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর নৃত্যাঙ্গন মুখর করে তোলেন নিতাই গৌড়, প্লাবন দত্ত, সীমা ভৌমিক, বন্যা, সুরাইয়া আক্তার পপি, শাহনাজ সিদ্দিকী মুন্নি, মৌসুমী রহমান, তাহমিনা খান মিতু, রোকেয়া আকতার ডলি, সঞ্চিতা নন্দী, সঙ্গীতা নন্দী, সাজিয়া সুলতানা শিলা, সুবর্ণা রহমান কেকা, ইমু, সম্পা, আবুল বাসার আবু, আমিনুল ইসলাম কচি, বাবু, সাদি সালমান, আইয়ুব আলী, লুনা আনাহলী, চম্পা, শিউলী, শায়লা আলম ক্যাথি, সোজিয়া আফরিন, তৃষা, ফাগুন, মিতু, আশা, ইরামনি, অনন্যা ভট্টাচার্য। নৃত্যজগতে এখনো যারা সক্রিয় আছেন তাদের মধ্যে আজাদ খান, রুবাইয়া শারমিন, রনি চৌধুরী, রিফাত পারভীন হৃদয়, জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাপি, মেহেদী হাসান রিপন, স্মৃতি, মেহেরুন নেসা অর্থি, মিফতাহুল জান্নাত জেবা, স্বর্ণা, সঞ্চিতা করবী কনক, মুসাররাত জামান খান মেধা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, নূপর নিক্কন নৃত্যনিকেতন, শৈলী শিল্পচর্চা নিকেতন, নৃত্যাঙ্গন, নৃত্যধারা, নৃত্যপ্রাঙ্গণ, শতদল সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-সংগঠন টাঙ্গাইলের নৃত্যকলার শ্রীবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে; এখনো রাখছে।

নাটক

টাঙ্গাইলের নন্দন-সংস্কৃতি-ভুবনে নাটকের ইতিহাস সুপ্রাচীন ও ঋদ্ধ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (সিডিসি) ও ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইল ক্লাব, বিশেষ করে সিডিসি টাঙ্গাইলের নাট্যজগতে ইতিহাস সৃষ্টি করে। সিডিসি এখনো প্রায় প্রতিবছরই নাটক মঞ্চায়ন করে। এই সংগঠন ছাড়াও ফ্যাকাসে সম্মিলনী, নাট্যবিতান, নাট্যমহল, সরগম, সুরবাণী, বিশ্বাস বেতকা ক্লাব, জোনাকী নাট্যসংস্থা ইত্যাদি সংগঠনও টাঙ্গাইলে নাট্যচর্চা ও নাট্যকলার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এর চেয়েও গৌরবজনক অধ্যায়টি হচ্ছে– এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠার পূর্বেও টাঙ্গাইলে নাট্যচর্চা ছিল। অনেক গ্রামে ছিল নাট্যমঞ্চ। সন্তোষের জমিদারদের দুটি নাট্যমঞ্চে তখন প্রায়

নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতো। মহারাজা প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও মন্মথ রায়চৌধুরী নাটকের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা। ঘারিন্দার 'নট-নাট্যম', সাকরাইলের 'সাকরাইল অপেরা', আইসরার 'সূর্যমুখী নাট্যসংঘ', এলেঙ্গার 'ইয়াংম্যান ড্রামা সার্কেল', বাঘিলের 'নাট্যরসিকসংঘ' কালিহাতির ঘড়িয়া মালতির 'কমলা নাট্যসমাজ' নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করেছে। টাঙ্গাইলের জমিদার-জোতদাররা নাটকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। করটিয়া, মহেড়া, পাকুল্লা, পাকুটিয়া, এলেঙ্গা, শিবপুর, অলোয়া প্রভৃতি জমিদারবাড়িতে নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে। এলেঙ্গা গলগণ্ডা ও হেমনগর জমিদারবাড়িতে পাকামঞ্চ ছিল।
১৯১০ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল শহরে মাসব্যাপী প্রদর্শনী-মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানেও নাটক-মঞ্চায়ন হতো। সাকরাইল অপেরার ক্ষীরোদা প্রসাদ রচিত 'আলী বাবা' ও এলেঙ্গার ইয়াংম্যান ড্রামা সার্কেলের 'ময়ূর সিংহাসন' নাটক দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখন। তৎকালীন দু'জন নাট্যব্যক্তিত্বের নাম পাওয়া যায়– প্রেমাদিত্য ঘোষ ও মনমোহন নিয়োগী– যারা নিজেদের সৃজনশীলতা যুক্ত করে নাটকের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

টাঙ্গাইলে, নাটকের বিকাশের পথিকৃৎ সিডিসি– আর বিকাশ-সাধনের পথিকৃৎ সৈয়দ নূরুল হুদা। পঞ্চাশের দশকে নাটক-মঞ্চায়নে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরিচালনায় সিডিসি মঞ্চায়ন করে নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাটক 'উল্কা।' 'উল্কা'ই সিডিসি'র মাইলস্টোন। এ-নাটকেই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে (পূর্ণিমা সেন, গীতা দত্ত...)। এই নাটকেই প্রথম কাঠের সেট ব্যবহার করা হয়, দ্বিতল সেট নির্মাণ করা হয়, এই নাটকেই প্রথম কার্বন স্পট লাইটের ব্যবহার হয়।

'উল্কা' মঞ্চায়নে সেই সময়ে, যখন সোনার ভরি ছিল ৮২ টাকা; তখন ১৯ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল; যার পুরোটাই বহন করেছিলেন দেলদুয়ারের জমিদারবাড়ির জামাতা শাহেদ আল জামালী (বিজু মিয়া)।

পঞ্চাশের দশকে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন গ্রাম ও স্কুল-কলেজে বার্ষিক নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গালা গ্রামে, প্রখ্যাত নাট্যকার বাংলা একাঙ্কিকার জনক মন্মথ রায়ের বাড়িতে বাঁধামঞ্চে অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কালিহাতির বল্লায় স্কুলশিক্ষক সতীনাথ গড়ে তুলেছিলেন নাট্যগোষ্ঠী। বাসাইলের ঝনঝনিয়ায় আবদুল হাই ও টাঙ্গাইল সদরের বীরপুশিয়া নাট্যচর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সতীনাথের যোগ্য শিষ্য আজকের প্রখ্যাত নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা মামুনুর রশীদ।

পঞ্চাশের দশকে সৈয়দ নূরুল হুদা ছাড়াও বদিউজ্জামান খান, আক্তারুজ্জামান খান লেবু মিঞা, হাবিবুর রহমান আনাহোলী, মোহাম্মদ আলী, ধীরেন সাহা, ঋষিকেশ, অপরেশ চক্রবর্তী, নিবেদিতা মণ্ডল, ভানুচন্দ, ইক্কু মিয়া, নান্নু মিয়া প্রমুখ নাট্যজগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দিঘুলিয়া এলাকায় কাজী সাকেরুল মণ্ডলার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ইউনাইটেড ক্লাব।' এই ক্লাবের উদ্যোগে করোনেশন রঙ্গমঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চায়িত হয় 'নায়িকার জীবন' নাটক। এই নাটকটিও পরিচালনা করেন সৈয়দ নূরুল হুদা। একই বছর প্যাড়াডাইসপাড়ার প্রিয়নাথ সেনের বাড়ির উঠোনে তারাপদ দে'র পরিচালনায় মঞ্চায়িত হয় 'গুরুদক্ষিণা' নাটক। '৬৬, '৬৭, '৬৮ খ্রিস্টাব্দে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় নাটক মঞ্চায়িত হয়।

ষাটের দশকে টাঙ্গাইলের নাট্যজগত দাপিয়ে বেড়ান সুবিনয় দাস, জওশন খান, শামসুর রহমান খান সাজাহান, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, আবু কায়সার, বুলবুল খান মাহবুব, মাহফুজ সিদ্দিকী, সাযযাদ কাদির, আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, লক্ষ্মণ নন্দী, দুলাল আনাহোলী, ফারুক কোরেশী, হামিদুল হক মোহন, মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, শামীম আল মামুন প্রমুখ।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে টাউন প্রাইমারি স্কুলমাঠে মঞ্চায়িত হয় 'সিরাজের স্বপ্ন।' নাটকটি পরিচালনা করেন লুৎফর রহমান খান। এই নাটকের মাধ্যমেই পরবর্তীকালের খ্যাতিমান নাট্যব্যক্তিত্ব আবদুর রহমান রক্কু, গোলাম আম্বিয়া নূরী, শফিকুল ইসলাম মনি প্রমুখের আবির্ভাব ঘটে।

ষাটের দশকে পূর্বআদালতপাড়ার এডভোকেট সুধীর রায়ের বাড়ির আঙিনায় অশোক গাছের নিচে বেশকিছু নাটক মঞ্চায়িত হয়। ফলে ঐ স্থানটি 'অশোক রঙ্গমঞ্চ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের পর টাঙ্গাইলের নাট্যজগতে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। ৭২ খ্রিস্টাব্দে করোনেশন রঙ্গমঞ্চে 'নাট্যবিতান সমষ্টি' পরিবেশন করে গীতিনাট্য 'মুক্ত স্বাধীন বাংলা'। এই গীতিনাট্য পরিচালনার মাধ্যমে দুইবন্ধু ফারুক কোরেশী ও আব্দুর রহমান রক্কু জুটিবদ্ধ হয়ে 'ফারুক-রক্কু' নামে পরিচিতি লাভ করেন। নাটক পরিচালনায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই জুটি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই করোনেশন রঙ্গমঞ্চে যে পূর্ণাঙ্গ নাটকটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি ছিল বিশ্বাসবেতকা ক্লাবের নাজমুল আলমের লেখা 'অনিতার কান্না।' এই নাটকে আদিভৌতিক পরিবেশে আলোকসম্পাত ও শব্দক্ষেপণের উৎকৃষ্ট কারিগরি কৌশল প্রয়োগ করে যে বিমূর্ততা সৃষ্টি করা হয়েছিল; তা ছিল টাঙ্গাইলের মঞ্চে একটি নতুন আঙ্গিক সংযোজন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফারুক-রক্কু'র পরিচালনায় নাট্যবিতান মঞ্চায়ন করে 'আমি মন্ত্রী হব'। এই নাটকটি টাঙ্গাইলের নাটক মঞ্চায়নের রীতি-রেওয়াজ ভেঙে একটি নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। এই নাটক করোনেশন রঙ্গমঞ্চে তথা টাঙ্গাইলে প্রথম নাটক, যা ঘোষিত যথাসময়ে মঞ্চস্থ হয়।

টাঙ্গাইলের নাট্যান্দোলনের নতুন আঙ্গিক শুরু হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। গ্রুপ থিয়েটারের আদলে গঠিত হয় অন্বেষণ, বহুবর্ণ থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যসংগঠন, যারা দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে।

সত্তরের দশকে নাটক রচনা, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন আলমগীর খান মেনু, কাদের শাহ, মজিবর রহমান (জমিদার), গোলাম আম্বিয়া নূরী, আফাজ মোল্লা, মোজাম্মেল হক, নারু, তারু, কালু, আদেল, বাদল, শাহজাহান মিয়া, ফিরোজ মিয়া, মাইন চিশতী, নিতাই গৌড়, আখতার হোসেন বোখারী, আকবর কবীর, রতন দত্ত, মোতাহার হোসেন, শাহীন তালুকদার, বাবুল আনাহোলী, সাত্তার আনাহোলী, সাইদুর রহমান ঠান্ডু, জয়নাল মুন্সি, জসিম বয়াতি, নসিম উদ্দিন প্রমুখ। এ সময় মিনু আনাহোলী, রহিমা, লাইলী, মিনা, স্বপ্না, শ্যামলী, মলি প্রমুখ নাটক করতেন।

আশির দশকে আধুনিক ও সৃজনশীল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার বুকে ধারণ করে জন্ম নেয়– 'মফস্বল নাট্যসম্প্রদায়' ও 'কল্যাণ থিয়েটার।' এই দুই সংগঠন পরিবেশিত নাটকগুলো দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়। এছাড়া 'চৌকস গ্রুপ থিয়েটার', 'নান্দিকার' ও 'বৈকালিক' টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চাকে বেগবান করে। সর্দার আজাদ ওই সময়ের প্রতিভাবান নাট্যপরিচালক।

১৯৭৭, '৭৮, '৮০ ও '৮১ খ্রিস্টাব্দের শিল্পকলা একাডেমির নাট্যোৎসব এবং নব্বই-এর দশকে শিশু একাডেমির শিশুনাট্য উৎসব টাঙ্গাইলের নাট্যচর্চাকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত নাটক রচনা, পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছেন রাশেদ রহমান, তৌফিক আহমেদ, জাকির খান, শহীদুল ইসলাম লেবু, তালহা আল মাহমুদ খান, আলী হোসেন আলী, জহুরুল ইসলাম, ফিরোজ খান সাবু, পল্টন দত্ত, এনামুল হক দীনা, তুলসী দাস, বেলাল চৌধুরী, আবু সাঈদ, টুটুল, কুশল ভৌমিক, স্বপন, শোভন, বজলু, উজ্জ্বল, কাজল, আজাদ, এলিজা আক্তার মুক্তা, পাপিয়া সেলিম, জাকির খান, রফিক আনসার, শাহীন, মোহাম্মদ আলী, রিতা আক্তার, আলী হোসেন, মহসিন, শাপলা, পিন্টু, শিউলী, বিউটি, রাহাত, লেবু, মোহিন, আল আমীন, মামুন, সীমান্ত, নাঈমা পান্না, রাদিয়া নীলা, ঊর্মি রহমান, দিগন্ত, দীল, হিয়া, দিয়া, সাদিয়া প্রমুখ।

টাঙ্গাইলে বেশ কিছু নাট্য সংগঠন নিয়মিত নাটক প্রযোজনা করছে। এদের মধ্যে নাট্যম, সংকেত, নাট্যস্রোত, নাট্যসম্প্রদায়, নগর নাট্যদল, স্বদেশ নাট্যদল, টাঙ্গাইল থিয়েটার, থিয়েটার টাঙ্গাইল, কারক, সারেং, গালা ভূমিহীন নাট্য দল, আনন্দ শিশু নাট্যদল, শিশু থিয়েটার উল্লেখযোগ্য।

জয়তু টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি!

ঋণ স্বীকার

১. টাঙ্গাইল জেলা গেজেটিয়ার– প্রধান সম্পাদক, নূরুল ইসলাম খান
২. টাঙ্গাইলের ইতিহাস– খন্দকার আবদুর রহিম
৩. টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য– সম্পাদক, মুহাম্মদ বাকের
৪. টাঙ্গাইল জেলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি– সম্পাদক, সরকার নূরুল মোমেন

যাদুসম্রাট পি.সি. সরকার

বিশ্বজয়ী যাদুশিল্পী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে টাঙ্গাইলে যে কয়জন গুণী ও কৃতী সন্তানের জন্ম হয়েছিল যাদু সম্রাট পি.সি. (প্রতুলচন্দ্র) সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল পৌর এলাকার আশেকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে বিশ্বব্যাপী বাঙালির পরিচয় তুলে ধরেছেন। তখন কে জানতো যে, ভগবান সরকারের এই ডানপিটে ছেলেটি একদিন বাঙালির গৌরব হয়ে দেশ-দশের সুনাম অর্জন করবে। পি.সি. সরকার টাঙ্গাইল শহরের শিবনাথ হাইস্কুলে পড়ার সময়ই যাদু প্রদর্শন করে লোকদের হতবাক করে দিতেন। তাঁর সাধনা কঠোর অনুশীলন এবং সৃজনশীলতাই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। হাট-বাজারে প্রদর্শিত ভেলকিবাজির সাথে পি. সি. সরকারের উদ্ভাবিত যাদু কৌশলের ছিলো আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তিনিই প্রথম যাদুকে শিল্প হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন।

পিসি সরকারের যাদু প্রদর্শন নিয়ে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। একবার তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়ানো। নিকারিরা তার বাড়ির পাশ দিয়ে মাছের ঝাঁকা নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। তিনি তাদের মাছ দেখতে চাইলেও দেখায়নি। বাজারে গিয়ে তারা দেখে ঝাঁকায় মাছ নেই, সাপ ব্যাঙ আর বাঁশের পাতায় ঝাঁকা ভরা। একবার ময়মনসিংহে সিনেমা হলের টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকে সিট না পেয়ে তিনি ইন্দ্রজাল বিস্তার করেন। ছবি শুরু হলে দেখা গেলো ছবি কোথায়? পর্দা জুড়ে ভয়ংকর বাঘের লাফালাফি। এক অনুষ্ঠানে তার দশটায় যাবার কথা। বারোটার সময় তিনি সেখানে হাজির হলে সমালোচনার মুখে পড়েন। আয়োজকরা বলেন– আপনি বড্ড দেরি করেছেন। পিসি সরকার বললেন– মোটেও নয়। আপনারা ঘড়ি দেখেন এখনও ১০টা বাজতে আরও দু'মিনিট দেরি আছে। ঘড়ি দেখে সবাই অবাক। সত্যি ১০টা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

বিশ শতকের বিদগ্ধ মানুষ তাঁর যাদু দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশে যাদু প্রদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আমেরিকা, জাপান ও বৃটেনের মতো উন্নত রাষ্ট্রে তাঁর প্রদর্শিত যাদু দেখে সাধারণ নাগরিক থেকে রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়তেন। এসব কারণে তিনি পরিণত হয়েছিলেন কল্পরাজ্যের রাজপুত্রে।

পি. সি. সরকার অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ও মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিলো প্রচণ্ড দরদ। দেশের আচার-ঐতিহ্যের প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। নিকটবর্তী জালফৈ গ্রামে খাদেম আলী সরকার ও দিনমুজুর রায়েজ

মিঞাকে আন্তরিকভাবে সঙ্গ দিতেন। ভালোবাসতেন তাঁর প্রিয় শাপলা ফোটা পয়লা বিলের কৈ মাছ।

শোনা যায়, স্থায়িভাবে কোলকাতা চলে যাওয়ার সময় আশেকপুরের প্রাসাদতুল্য বাড়িটির কেয়ারটেকার নিযুক্ত করে যান প্রিয় ব্যক্তি রায়েজ মিঞাকে। কিন্তু কিভাবে যে এই ঐতিহাসিক বাড়িটির মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে তা অনেকেরই অজানা। আজও বাড়ির ফটকে ঝুলছে 'সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড অস্ট্রেলিয়া' নামফলক। এই যাদুশিল্পী নিজে তাঁর যাদুকে একচেটিয়া সম্পত্তি ভাবতেন না। যাদুশিল্পের প্রসার ও একে সহজলভ্য করে তোলার জন্য ম্যাজিকের কৌশল, হিপনোটিজম প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে চির অমর হয়ে আছেন।

যাদুসম্রাট পি.সি. সরকার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সত্যিই টাঙ্গাইলের গৌরব এবং কৃতিত্বের অধিকারী।

অনুপম ঘটক

বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক

আত্মা ছাড়া যেমন এ জীর্ণ দেহের কোনো মূল্য নেই, গন্ধহীন ফুলেরও যেমন মূল্য নেই, তেমনি সুর ছাড়া গানেরও কোনো মূল্য নেই। ভালো গান হতে হলে চাই ভালো সুর। তাইতো সুরের ক্ষেত্রে ছায়াছবির সুর স্রষ্টা অমর সুর শিল্পী অনুপম ঘটক ছিলেন অন্যতম। যিনি তার সুরের দ্বারা মানুষকে বিমোহিত করে তুলেছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সিনেমা পাগল মানুষ যারা আজও বেঁচে আছেন, তারা জানেন অনুপম ঘটক ছিলেন একজন প্রাণবন্ত সুরকার। এই সুর স্রষ্টার জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দেলদুয়ার উপজেলার টাঙ্গাইল শাড়ি খ্যাত পাথরাইল গ্রামে। পিতা অতুল চন্দ্র ঘটক। সঙ্গীতের বর্ণ পরিচয়টা ঘটে পিতার কাছেই। তারপর বেশ ক'জন ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। তিনি সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন। পরবর্তীতে কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কঠোর সাধনা দ্বারা সঙ্গীত জগতের বরেণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তদানীন্তন অনেক বিখ্যাত গীতিকারের কথায় সুরারোপ করে যশস্বী হন। চলচ্চিত্রেও ডাক আসে। কর্ণার্জুন, পাষাণ দেবতা, মায়ের প্রাণ, কার পাপে, শ্রীতুলসী দাস, অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ছায়াছবিতে সুরারোপ করে তিনি দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করেন। বিশেষ করে অগ্নিপরীক্ষার সাফল্য তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তিনি বেশ কয়েকটি হিন্দি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। এই প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞের অকাল মৃত্যুতে বাংলার সঙ্গীত জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ঘটক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় মহান শিল্পীর স্মৃতি বহন করে। তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের সুরের জগতকে আরও আকর্ষণীয় হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারতেন। কিন্তু এই সুর স্রষ্টা ব্যক্তিটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাটি ও সুর জগৎ ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন।

আবুল খায়ের মোহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী

নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ নাগরপুর উপজেলার দপ্তিয়র ইউনিয়নে আবুল খায়ের মোহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা তৈয়েব উদ্দীন আহমেদ সিদ্দিকী (পীর সাহেব) ছিলেন সাধক পুরুষ। শৈশবে আলী মিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু। মাদ্রাসা ও সাধারণ উভয় ধারায়ই তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হুগলী মাদ্রাসা থেকে 'জামাতে উলা' ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পাস করেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি স্বল্পকাল কলকাতায় চাকরি করেন। এ সময় অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ শুরু করেন। মিউজিক প্রডিউসার হিসেবে কাজ করার সুবাদে এ সময় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তান রেডিওর নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও নাট্য জগতে ছিল তার অবাধ বিচরণ। কালনাগিনী তার অনন্য সৃষ্টি। কালনাগিনী নাটকই তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন ইউএসআইএস-এ। এ সময় তিনি রেডিওর প্রধান ছিলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভয়েস অব আমেরিকায় যোগদান করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে ফিরে এসে শিল্পী, নাট্যকার ও গীতিকার হিসেবে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এখানে অতিবাহিত করেন।

সুখময় সংসার জীবনে সহধর্মিণী তাহুরা খাতুন, তাদের ছয় সন্তান। প্রথম সন্তান আব্দুল হাই সিদ্দিকী, বাংলাদেশ টেলিভিশনের (প্রেজেন্টেশন অডিটর) উপস্থাপক সম্পাদক। তাঁর সহধর্মিণী শাহানা ইসলাম, সন্তানেরা ডা. তানভীর হাসান সিদ্দিকী, প্রকৌশলী শাহরিয়ার হাসান সিদ্দিকী, সাবেকুননাহার রিনি, নাজমা সাঈদ সিদ্দিকী, সুগৃহিণী, সালমা সাঈদ সিদ্দিকী সুগৃহিণী, শামীম সিদ্দিকী ব্যবসায়ী, আসমা সাঈদ সিদ্দিকী সুগৃহিণী, সেলিম সিদ্দিকী প্রয়াত।

তিনি প্রিয়জনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁকে এলাকার পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

নিবেদিতা মণ্ডল

বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

যিনি আজীবন মন প্রাণ দিয়ে সংস্কৃতি চর্চা করেছেন এবং মানুষের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি হচ্ছেন নিবেদিতা মণ্ডল। তিনি টাঙ্গাইল সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের কয়েকজন নৃত্যশিল্পীর মধ্যে নিবেদিতা অন্যতম। এই আলোকিত মানুষটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষায় ছিলেন স্নাতক পাস। তার স্বামী টাঙ্গাইল কলেজপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা, রাজনীতিক ও আইনজীবী অমৃত লাল মণ্ডল, ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান হওয়ার পর বেশ কিছুদিন এমএলএ ছিলেন।

তিনি রাজনীতিতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এমএলএ নির্বাচিত হয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সরকারি বিন্দুবাসিনী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন নৃত্য পরিচালক ও শিক্ষক ছিলেন। টাঙ্গাইল আর্ট কাউন্সিল ও কুমুদিনী কলেজের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। জাতীয় মহিলা সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

সাংসারিক জীবনে তিনি ছিলেন দুই সন্তানের জননী। ডা. অমৃতাভ লাল মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও অরুণাভ মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী।

গোবিন্দ চন্দ্র দে

চারণ কবি, সুরকার ও গীতিকার

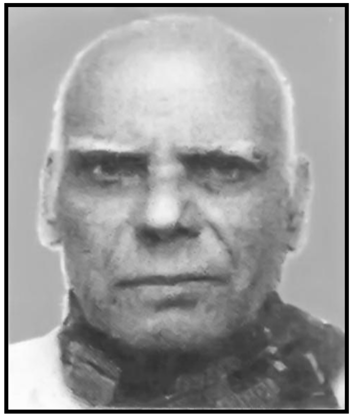

বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার, সাধক, গায়ক, কৌতুক অভিনেতা এককথায় বহুগুণে গুণান্বিত শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দে। সঙ্গীতের দ্বারা মানুষকে মাতিয়ে তোলায় রয়েছে যার দীপ্তময় ক্ষমতা। শ্রী গোবিন্দ দে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দেলদুয়ার উপজেলার হিঙ্গানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোপীনাথ দে। তার পিতাও ছিলেন একজন গায়ক। খুবই সুন্দর খমগ বাজাতেন। মানুষ নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে তার খমগ শুনতেন। মাতা টগর বালা দে ছিলেন সুগৃহিণী। তিনি ভাই বোনের মধ্যে গোবিন্দ্র চন্দ্র দে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শৈশবে গ্রামের স্কুলে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এবং ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। লেখাপড়া বেশি না করলেও গান রচনা ও সুরের ক্ষেত্রে রয়েছে তার অসাধারণ ক্ষমতা। গোবিন্দ চন্দ্র দে ১১ বছর বয়স থেকেই শ্যামাসঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়স থেকে গান রচনা শুরু করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৫শ এর উপরে গান রচনা করেছেন। মনোমুগ্ধকর কৌতুক গান রচনা করায়ও রয়েছে তার দক্ষতা। ইসলামী গান ও গজল রচনা করেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর উপর একটি গজল গাওয়ার জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি তাৎক্ষণিক যে কোনো বিষয়ের উপর গান রচনা ও গাইতে পারেন। লোক সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। গোবিন্দ চন্দ্র দে সংযাত্রায় দক্ষ অভিনেতা। তিনি বহুযাত্রা ও নাটকে অভিনয় করেছেন এবং গানও গেয়েছেন। তিনি চমৎকার কণ্ঠ বদলাতে পারেন অবিকল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের যুবকদের কণ্ঠের মত কণ্ঠ দিয়ে কথা বলতে পারেন। তার সামনে না থাকলে বুঝাই যেতো না গোবিন্দ চন্দ্র দে এই গান গাইছেন।

সংসার জীবন: ঘাটাইল উপজেলার মোহনপুর গ্রামের কন্যা ষোড়শী রাণী দে-এর সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসার জীবনে ৪ ছেলে ২ মেয়ের আদর্শ জনক। বড় ছেলে নব কুমার নয়া এসএসসি পাস। তিনিও সঙ্গীত সাধক। পিতাই নব কুমারের ওস্তাদ। নবকুমার বাবার আদর্শ ধরে রেখে দেশ-বিদেশে গান করছেন। নবকুমার 'নয়া কৃষি' আন্দোলনের একজন সদস্য ও প্রচারকর্মী।

গোবিন্দ চন্দ্র দে বাংলা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষে গান করেছেন, মানুষের অভাব, দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরে একটি গান রচনা করেন ও গেয়ে ব্যাপক সাড়া জাগান।

২০০২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলা তথ্য অফিসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেন এবং বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে তার গান প্রচারিত হয়।

গোবিন্দ চন্দ্র দে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নবীনবরণ, শিশুকিশোর অনুষ্ঠান, গ্রামগঞ্জে বৈঠকী গান, ওরস মোবারক, হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মারফতি গান, পালা গান, স্কুল-কলেজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিকনিক ও নৌকা ভ্রমণেও এই গোবিন্দ বয়াতীর গান শোনার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে তার বড় পুত্র নবকুমার পিতার সাথে গান গেয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সঙ্গীত ছাড়াও এ পরিবারের প্রধান পেশা হলো নিখুঁত শীতল পাটি বুনন।

সঙ্গীতের জগতে গোবিন্দ চন্দ্র দে এক অনন্য নাম। তিনি শুধু দেশেই গান করেননি, দেশের বাইরেও গান গেয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

গোবিন্দ চন্দ্র দে-এর অসংখ্য গানের পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যা প্রকাশের অপেক্ষায়। ছায়ানীড় হতে তার ১ম প্রকাশিত বই 'গানের মালা' পাঠকমহলে সমাদৃত।

তিনি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

মুজিবুর রহমান খান

বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

এক সময়ের বিশিষ্ট অভিনেতা, সংবাদ পাঠক, আবৃত্তিকার ও শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক মুজিবুর রহমান খান। নাগরপুর উপজেলার কৃতী সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। এই কৃতী সন্তান ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নাগরপুর উপজেলার সহবতপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ঘোনাপাড়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর এলাসিন টিজে উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই উৎপলেন্দু সেনের লেখা 'সিন্ধু গৌরব' 'হাতেম তাই'; নাটকে বিশেষ চরিত্রে ও মোতাহার আলী খান রচিত 'নিজাম ডাকাত'নাটকে নিজাম চরিত্রে অভিনয় করেন। উক্ত স্কুল থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন করে শিক্ষা অর্জনের ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাস্থ রিপন কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হন। ঐ সময়ে গোলাম আকবর রচিত 'চাঁদের দেশে' নাটকে বিশেষ চরিত্রে ও 'ওমর খৈয়াম' নাটকে ওমর খৈয়ামের চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গার সময়ে তিনি কলকাতা বেতারে নাট্যশিল্পী হিসেবে তালিকাভূক্ত হন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় চলে আসেন। এসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে অনুষ্ঠিত প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ রচিত 'কামাল পাশা' ও মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান' নাটক পরিচালনাসহ অভিনয় করেন। তিনি নিজেকে নিয়েই ভাবেননি। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চনাটকে মহিলাদের আবির্ভাবের সূত্রপাত ঘটান। তৎপর কাজী খালেদের পরিচালনা ঢাকা রেডিওর জীবন্তিকা' এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'টিপু সুলতান' নাটক 'মুখ ও মুখোশ' ছবিটির পরিচালক জব্বার খান ও তিনি যৌথভাবে পরিচালনা করেন। ঢাকা রেডিওতে তিনি চেঙ্গিস খান নাটকে অভিনয় করেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে রেডিওর প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। তৎপর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত কার্জন হলে অনুষ্ঠিত রবি ঠাকুর রচিত 'শেষ রক্ষা' নাটকে বড় দা চরিত্রে অভিনয় করেন। ঐ সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট বড়দা নামেও বেশি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি এসএম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৫টি নাটক তন্মধ্যে কবি ফররুখ আহমদের 'রাজ রাজারা' মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান', 'বন্ধু' ও 'কেরানির জীবন'-এ অভিনয় করেন। ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত নূরুল মোমেন রচিত ও পরিচালিত মঞ্চায়িত নাটক 'রূপান্তর'-এ অভিনয় করেন ও

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকীতে 'কর্ণ কুন্তি' কবিতা আবৃত্তি ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য সম্মিলনে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কিছু অংশ জহরতের সঙ্গে যৌথভাবে রাবণের চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত ও রফিকের সঙ্গে আন্দোলন করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত 'পথিক' নাটকটি তিনি পরিচালনা করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ডক্টর ক্লাবের উদ্যোগে 'বিজয়ী' নাটকের পরিচালনাসহ 'উদয় নালা' দুই পুরুষ মহাভারত চরিত্রে ও শচীন সেন গুপ্তের সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে গোলাম হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নীল দর্পণ নাটকে তোবার চরিত্রে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৪৯ হতে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বেতারের নাট্য প্রযোজক হিসেবে তিনি আব্দুল্লাহ, তিতুমীর, মসনদের মোহ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ ও প্লাবন প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর করাচি ইসলামিয়া কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি পূর্ববঙ্গ কৃষ্টি সংসদের সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির সভাপতি ও নজরুল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় করাচি বেতার থেকে ২৯৮ রাত একনাগাড়ে বাংলা সংবাদ পাঠ করেন। এমন কি তিনি সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তির বেতার সংবাদগুলো প্রস্তুত করে দিতেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'উজির' শব্দটি বাদ দিয়ে 'মন্ত্রী' বাংলা শব্দ সংবাদে পাঠ করেন। করাচির পূর্ব বঙ্গ কৃষ্টি সংঘের উদ্যোগে তারই পরিচালনায় কাঠরাক হলে মানচিত্র এ্যালবাম, সিরাজ-উদ-দৌলা, মাটির ঘর ও বারো ঘণ্টা নামক নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়।

করাচি বেতারে তারই রচিত 'বাংলা বলুন' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রচার হতো এবং পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছায়াছবি 'নবারুণ' এ তিনি অভিনয় করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের করাচিতে তার সর্বশেষ পরিচালিত নাটক মুনীর চৌধুরী রচিত 'জমা-খরচ ও ইজা' প্রচার হয়। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে করাচী থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ ও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তৎপর তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাটক বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারই উদ্যোগে পরপর দুইবার জাতীয় যাত্রা ও নাট্য উৎসব উদযাপিত হয়। তিনি সার্কাস ও যাদুবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের সঙ্গে ভাষা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে মির্জাপুর উপজেলার বানিয়ারা গ্রামের খন্দকার আজিজুর রহমানের ৪র্থ কন্যা আঞ্জুমান আরার সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্ত্রী প্রথমে করাচী পরবর্তীতে ঢাকায় এসে ধানমণ্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তার একমাত্র পুত্র ডা. মুনিবুর রহমান খান (আমেরিকা প্রবাসী),

পুত্রবধূ ডা. কানিজ ফাতিমা চন্দনা ও কন্যা মুনিয়া (টুনি) বিবাহিতা (অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত) এর আদর্শ জনক।

বহু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মুজিবুর রহমান খানের জীবন কাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারই ভাতিজা এডভোকেট আব্দুস সবুর খান বলেন, 'আমার চাচা সৎ, ন্যায় ও আদর্শের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি স্তরেই সফল পদচারণা করেছেন। তিনি পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। শুধু টাঙ্গাইল নয়, বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

লোকমান হোসেন ফকির

বিশিষ্ট সুরকার, গীতিকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

টাঙ্গাইল জেলার কৃতী সন্তান, প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীত জগতের এক অনন্য নাম, ইতিহাসখ্যাত সুরকার ও গীতিকার লোকমান হোসেন ফকির ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলাধীন নিকরাইল গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ মমতাজ উদ্দিন ফকির, মাতা কছিরন বেগম। বড় ভাই আফাজ উদ্দিন ফকির ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলার তৃতীয় ধনী। অন্য বড় ভাই মো. মকবুল হোসেন ফকির।
তাঁর সুযোগ্য ভাতিজা ফকির মাহবুব আনাম স্বপন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব।
বিশিষ্ট গীতিকার, কবি, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত সংগঠক, চলচ্চিত্র পরিচালক, সুরকার, লেখক এবং সমাজসেবক লোকমান হোসেন ফকির নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পলশিয়া রাণী দিনমণি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। উক্ত বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর সিরাজগঞ্জ বি.এল কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। তারপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।
ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বেতারে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। স্বল্প সময়েই তাঁর প্রতিভা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও সাধনার মাধ্যমে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বেতার ও টেলিভিশনে কবি ও সুরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর লেখা কবিতা, গান ও সুর অনেক প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সকল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি স্বীয় সৃষ্টি কর্মধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সংস্কৃতি অঙ্গনের আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এতে তিনি সংস্কৃতি অঙ্গনের বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ ও মত বিনিময় করেন। তিনি শুধু সুরকার ও গীতিকারই ছিলেন না, একজন সফল চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকও ছিলেন বটে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোককাহিনি ভিত্তিক 'মলুয়া' ছায়াছবি নির্মাণ করেন। এই ছবির তিনি ছিলেন একাধারে প্রযোজক, পরিবেশক, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার। উক্ত ছবি পরিচালনা করেই তিনি চলচ্চিত্র পরিচালকগোষ্ঠীর সদস্য হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত "তিতাস একটি নদীর নাম" পরিবেশন

করে সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা সেই সময়ে নন্দিত পরিবেশনা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'চরিত্রহীন' ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উপমহাদেশের খ্যাতিমান সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও উষা মুঙ্গেশকর প্রত্যেকেই লোকমান হোসেন ফকিরের কয়েকটি গান তাঁদের কণ্ঠে গেয়েছেন।

তাঁর বহু গান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত। যেমন-পতাকার লাল সূর্যটা, আমায় একজন সাদা মানুষ দাও এবং আমি লিখতে পেরেছি সেরা মুক্তির ইতিহাস ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোর সঙ্গীতে নির্বাচিত হয়। সাংস্কৃতিক জগতের একজন সফল ও সার্থক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে একুশে (মরণোত্তর) পদক লাভ করেন। তিনি অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠান নিজ হাতে গড়েছেন। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ফাল্গুনী সাংস্কৃতিক সংগঠন, ফুল পাখি খেলাঘর আসর, লোকজ বাংলাদেশ, সোনালী সপ্তক ও নারায়ণগঞ্জ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (নাফা) ইত্যাদি সংগঠনের সফল পরিচালক ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন আর্টিস্ট ফর ওয়ার্ল্ড পিসের জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনি সঙ্গীত বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়াও নারায়ণগঞ্জে তিনি প্রথম গড়ে তোলেন সঙ্গীত ললিতকলা একাডেমি, লোক সঙ্গীতগোষ্ঠী, গীতিকবি সংসদ ও গণচিন্তা প্রকাশ না সংস্থা তাঁরই সাংগঠনিক কর্মদক্ষতার দৃঢ় নেতৃত্বের হীরক সাক্ষী। লোকমান হোসেন ফকির ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠা করেন বেগম মমতাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

তিনি শুধু সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। শিক্ষা বিস্তারেও তার বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শমসের ফকির মহাবিদ্যালয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তরাঞ্চলের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মমতাজ ফকির উচ্চ বিদ্যালয় এবং মমতাজ ফকির এবতেদায়ী মাদরাসাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, বহু সংগঠনে তাঁর অজস্র দান রয়েছে। তিনি গরীব মানুষের ত্রাণকর্তা ছিলেন। মানুষকে ভালোবাসতেন মন উজাড় করে। বহু অর্থ সম্পদ মানুষের কল্যাণে অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। এলাকার মানুষ তাকে আজো অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকে।

লোকমান হোসেন ফকিরের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি, যেমন-১। আমি দিন গুণছি (কাব্য) ২। লোকমান ফকিরের গান (গান) ৩। জীবন যেমন (কাব্য) ৪। ভাবনা পারাপার। লোকমান হোসেন ফকির ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁরই সুযোগ্য ভাতিজা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ফকির মাহবুব আনাম স্বপন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'লোকমান ফকির মহিলা ডিগ্রি কলেজ।'

মো. হাবিবুর রহমান

ভাষাসৈনিক, সাবেক মহাপরিচালক: বাংলাদেশ টেলিভিশন

মো. হাবিবুর রহমানের পৈতৃক নিবাস ছিলো টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাধীন লোকেরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান চিটাগাং কোম্পানি নামে পরিচিত বৃটিশ পাট কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। আব্দুর রহমান উক্ত কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে পাবনা জেলার ভাঙ্গুরাতে সপরিবারে বসবাস করতেন। হাবিবুর রহমান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভাঙ্গুরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছোট বোন সাফিয়া খাতুনের জন্মের পর তার মাতা মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। তার ছোট ভাই বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মো. হাসিনুর রহমান ও ছোট বোন সাফিয়া খাতুন নাবালক থাকায় তার পিতা পরহেজগার মোসাম্মৎ হামিদা খাতুনকে বিবাহ করেন। হামিদা খাতুন হাবিবুর রহমান ও তার ভাই-বোনদের নিজের গর্ভের সন্তানের মতো আদর স্নেহ দিয়ে লালন করেছেন। তিনি সমাজসেবিকা ছিলেন। তিনি আপোয়া (All Pakistan Womens Association)-এর টাঙ্গাইল শাখার সভানেত্রী ছিলেন। তার পিতা আব্দুর রহমান অত্যন্ত পরহেজগার ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ খরচে ভাঙ্গুরাতে হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

হাবিবুর রহমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পিতার কর্মস্থল ভাঙ্গুরাতে। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ হতে আইএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি উভয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

তিনি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ এবং করটিয়া সা'দত কলেজে বেশ কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ব্রডকাস্টিং এন্ড ইনফরমেশন অফিসার হিসেবে প্রথম রাওয়ালপিন্ডি ও পরে ইসলামাবাদে চাকরি করেন। ইসলামাবাদে চাকরিকালীন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মনে-প্রাণে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তার বড় ভাই মো. হামিদুর রহমান মিয়া স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তাঁর বড় ভাই মো. হামিদুর রহমান ওরফে হামিদ মিয়া স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক

ছিলেন। হামিদ মিয়া স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বিবেকানন্দ হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের আকুরটাকুরপাড়ার রহমান ভিলায় তার পিতা-মাতা বাস করতেন। পাকসেনা রাজাকারদের ভয়ে তাদের বাড়ির আশেপাশের যুবতী হিন্দু মেয়েরা তাদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করতো। হাবিবুর রহমানের আপন বড় বোনের ছেলে মাহবুবুল আলম সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

হাবিবুর রহমান ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসক মজিবর রহমানের কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌসির সাথে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিন কন্যার আদর্শ জনক তিনি। প্রথম কন্যা ডা. আজিমা আশরাফ তিন্নি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস করেন। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর এমডি কোর্স করেন। ডা. আজিমা আশরাফের স্বামী সৈয়দ আলী আশরাফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। দ্বিতীয় কন্যা আম্বারিন ফেরদৌস তিতলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার স্বামী আবু মো. জিয়া কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তৃতীয় কন্যা আন্তালিন ফেরদৌস (তোনামি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তার স্বামী মো. ওয়ালিউল্লাহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিন কন্যাই তাদের স্বামীসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাসরত।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং দুই মাস কারাবরণ করেন। তার প্রিয়তমা সহধর্মিণী ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি করে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক থাকাকালীন তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যান। তিনি সরকারি চাকরি হতে অবসরের পর ইউনাইটেড প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে বেশ কিছুদিন কাজ করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকার বাবর রোডস্থ নিজ এ্যাপার্টমেন্টে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। তবে মাঝে মাঝে আমেরিকাতে মেয়েদের কাছে চলে যান।

এফ কবীর চৌধুরী

চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক

দেশের ছাত্র-গণ আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক বিনোদনধর্মী ব্যবসাসফল ছবির নির্মাতা এফ কবির চৌধুরী ঘাটাইল উপজেলার সুপরিচিত নাম। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার কোলাহা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোয়াজ্জম হোসেন। তিনি ঘাটাইল গণ উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি লেখাপড়া শেষ করেন ভূঞাপুর কলেজ থেকে। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন ধর্মভীরু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়ে চলচ্চিত্র জগতে কাজ করায় পরিবার থেকে তাকে ভর্ৎসনা পোহাতে হয়। পরিবারের অনেক চাপ সত্ত্বেও তিনি চলচ্চিত্র ছাড়েননি।

ঢাকায় কর্মজীবন শুরু করেন চিত্র সাংবাদিক হিসেবে। পরবর্তীতে সহকারী পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম ছবি সুপারহিট হওয়ার পরেও তাকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী ছবি নির্মাণের জন্য। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় 'রাজমহল', 'বুলবুল-এ বাগদাদ' ও 'শীষনাগ'। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'রাজকন্যা' ও 'আলিফ লায়লা'। ৮১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় 'সুলতানা ডাকু'। ৮২ খ্রিস্টাব্দ মুক্তি পায় 'সওদাগর' ও 'রাজ সিংহাসন'। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ 'আবেহায়াত' ও 'তিন বাহাদুর'। আবেহায়াত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গড়ে তুলেন 'ড্রীমল্যান্ড' নামে প্রযোজনা সংস্থা। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'পদ্মাবতী' ও 'জালিম'। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ 'মর্জিনা' ও 'নরম-গরম'। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'তালাচাবি' ও 'বাহাদুর মেয়ে'। ৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'পর্বত'। ৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'পয়সা পয়সা' ও যৌথ প্রযেজনার ছবি 'এক দুই তিন'। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে 'নীল দরিয়া'। তার পরিচালিত ২২টি চলচ্চিত্র সিনেমা হলে মুক্তি পায়। 'প্রেম তুই সর্বনাসী', 'পকেটমার', 'কালনাগিনী, 'বদনাম বদনাম' ও 'পরমা সুন্দরী' চলচ্চিত্র নির্মানাধীন ছিল। আশির দশকে ফোক ছবির নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা। তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রই ছিল সুপারহিট। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ঘাটাইলের সহ-সভাপতি, ঘাটাইলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'কনক সিনেমা' হল। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ তিনি ব্রেইন হেমারেজে ইন্তেকাল করেন।

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল কাদের

শিক্ষাবিদ ও নাট্যব্যক্তিত্ব

অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ আবদুল কাদের। কাদের শাহ্ হিসেবে সুধীমহলে সুপরিচিত। কালিহাতি উপজেলার মিরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪২ খ্রি. ২ নভেম্বর তার জন্ম। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শাহ্ মোহাম্মদ আলী এবং মাতা আমেনা খানম। শৈশবে গ্রাম্য স্কুল হতে বাল্য শিক্ষা লাভের পর ১৯৫২ খ্রি. ফুলতলা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে প্রাথমিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এ ধারা অব্যাহত রেখে ১৯৫৩ খ্রি. ততোধিক মেধা প্রদর্শন করে নিম্নমাধ্যমিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রি. এলেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় হতে কৃতী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ হতে আই.কম পাস করেন ১৯৬০ খ্রি.। সা'দত কলেজ, করটিয়া হতে ১৯৬২ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে বি.কম পাস করেন। ১৯৬৫ খ্রি. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে মেধা তালিকায় ২য় শ্রেণিতে ৭ম স্থান অধিকার করে এম.কম পাস করেন।

কাদের শাহ্ অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ খ্রি. ২১ আগস্ট সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত হন। স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে যোগদান করে ১ বৎসর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. পুনরায় সরকারি মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে যোগদান করেন। ১৯৯১ খ্রি. ৪ সেপ্টেম্বর ২য় বার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৫ খ্রি. ২ জুন প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়ে চাঁদপুর সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন। ১৯৯৬ খ্রি. ২৫ নভেম্বর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়ে তিনি নাগরপুর সরকারি কলেজে যোগদান করেন। ২০০০ খ্রি. ১ নভেম্বর এই কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ কাদের শাহ্ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত নিবিড়। কমার্সের শিক্ষক হলেও তার মনোভাব কমার্শিয়াল ছিল না। অনেক দুষ্ট ছাত্র তার সান্নিধ্য লাভ করে আলোকিত মানুষ হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি ছাত্র/ছাত্রীদের শিখিয়েছেন 'A light can never lighting another lamp unless it continious it's own flame' অর্থাৎ একটি মোমবাতি তখনই অন্য একটি মোমবাতিকে আলো দিতে পারে যখন ঐ মোমবাতি নিজে আলো দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। যার নিজেরই আলো নাই তার পক্ষে

অন্যকে আলো দান করা সম্ভব না। তিনি ছাত্র/ছাত্রীদের বলতেন তোমরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সেই শিক্ষার আলো দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতিকে আলোকিত করবে। তার শিক্ষাকে ধারণ করে তার অনেক ছাত্র আজ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাদের শাহ্ ছিলেন একজন বিশিষ্ট্য নাট্যকার। খুব অল্প বয়স হতে তিনি নাটক লিখতেন এবং গ্রামের সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে স্থানীয়ভাবে নিজের লেখা নাটকগুলো মঞ্চায়িত করতেন। ষাট দশকে তার লেখা নাটকগুলো দর্শক মহলে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে ভাগাড়, চাকা, শান্তিপুরে যাবো, সামনেই লাইটপোস্ট, আমার ঠিকানা, কখন ভোর হবে, টোকাই ট্রাফিক জ্যাম, ঝরা বকুল ফুল, শতাব্দীর রূপ, মালঞ্চমালা নাটকগুলো দর্শক মহলে খুবই সমাদৃত। ১৯৮৬ খ্রি. তার লেখা গীতিনাট্য লৌহজং এর পাড়ে, বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। অধ্যক্ষ কাদের শাহ্ এর নাটকগুলো ছিল বাস্তবধর্মী ও হৃদয়স্পর্শী। তার প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ নাট্যসম্ভার-১, নাট্যসম্ভার-২, আরো প্রায় ২ ডজন নাটক প্রকাশের অপেক্ষায়। তার লেখা নাটকগুলোতে সমাজ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের শক্তিশালী ম্যাসেজ থাকতো। তিনি শুধু নাট্যকারই ছিলেন না তিনি ভালো কবিতাও লিখতেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ অগ্নিগিরি জ্বালামুখ জ্বলন্ত লাভা, আমি আর নেই, রচনাসম্ভার বইগুলো পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

অধ্যাপক কাদের শাহ্ ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ খ্রি. মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন শব্দ সৈনিক। তিনি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর মুখপাত্র রণাঙ্গন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি তার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রয়াজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে সবাইকে সংগঠিত করেন। তার নেতৃত্বে ১৯৭১ খ্রি. ১ মার্চ কাগমারী কলেজের ছাত্রদের ১ম যুদ্ধের ট্রেনিং করানো হয়। ঐ সময়ে তাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন পূর্ব বাংলার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার জয়নাল আবেদীন। ২ মার্চ টাঙ্গাইল শহরে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মিছিল আহ্বান করা হয়। ঐ মিছিলে যে গানগুলো সমস্বরে গাওয়া হয়েছিলো তার গীতিকার ছিলেন অধ্যক্ষ কাদের শাহ্ এবং সুরকার ছিলেন বাবু মিলন সরকার।

কাদের শাহ্ ছিলেন একজন নিরহংকার নির্লোভ মানুষ। অর্থ, ধন-সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ ছিল না। চরম আর্থিক দুঃসময়েও তিনি অর্থের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুসুলভ মিশুক প্রকৃতির মানুষ। সবাইকে তিনি খুব সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। শেষের দিকে, আর্থিক দীনতা না থাকলেও তিনি খুব সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন। চাকরির শেষ সম্বল দিয়ে একমাত্র ছেলেকে পাকা ভবন তৈরি করে দেন কিন্তু তিনি ঐ ভবনে থাকতেন না। তিনি বলতেন আমার বাবা টিনের ঘরে থাকতো আমিও টিনের ঘরেই বাকী দিনগুলো কাটাতে চাই।

অধ্যাপক কাদের শাহ ছিলেন একজন ভালো সংগঠক। ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে তিনি এলেঙ্গার সাধারণ মানুষদেরকে একত্র করেন। এলেঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত শামসুল হক কলেজ

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। ঐ কলেজের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তারই অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা হাকিম তালুকদার এবং প্রতিষ্ঠাকালীন অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দীর্ঘ তিনবছর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ঐ কলেজের প্রথম যে সাইনবোর্ড টানানো হয়, তা তার টাকায় কেনা এবং ঐ কলেজের জন্য তারা দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নতুন প্রজন্ম তার এই অবদানের কথা জানে না।

কাদের শাহ্ ব্যক্তি জীবনে সহধর্মিণী শাহ্ নাসরিন জাহান। একমাত্র পুত্র শাহ্ মেহেদী মাসুদ সুমন কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিক, অভিনেতা। চার কন্যা শাহ মিরাতুল কানিজ ফাতিমা কণা, শাহ জান্নাতুল ফেরদৌস রুনা, শাহ বদরুননাহার বর্ণা (কলেজ শিক্ষিকা, লেখিকা ও কবি) এবং কনিষ্ঠা শাহ্ কামরুননাহার স্বপ্না (স্কুল শিক্ষিকা) এর আদর্শ জনক।

তিনি দীর্ঘদিন এজমাজনিত রোগে ভুগছিলেন। ৭৩ বছর বয়সী এই মহৎপ্রাণ মানুষটি সবার সাথে অভিমান করে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ২০১৩ খ্রি. ১৫ ডিসেম্বর, বিকেল ৪:০৫ মিনিটে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে যান।

অমর সিংহ নিয়োগী

তবলা শিক্ষক

টাঙ্গাইল শহর হতে ২ মাইল দূরে সাকরাইল গ্রামের জমিদার পরিবার 'মুন্সীবাড়ি' খ্যাত ছোট তরফে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল অমর সিংহ নিয়োগী (বদন) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দিলীপ সিংহ নিয়োগী। দুই ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছোট। জন্মের ৪ মাস পর পিতার মৃত্যুতে তিনি মায়ের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন সাকরাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি মধুপুর তার পিসেমশায় ডা. অমলেশ চন্দ্র গুহর বাড়ি চলে যান। সেখানেই চাড়ালজানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার নতুন শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ডা. অমলেশ চন্দ্র গুহ সপরিবারে ভারতে চলে যাওয়ায় তিনি টাঙ্গাইলে চলে আসেন এবং নবম শ্রেণিতে বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাধ্যমিক পাস করে এম এম আলী কলেজ হতে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাস করেন।

সঙ্গীত জীবন: তার সঙ্গীত জীবন শুরু হয় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তবলা শিক্ষার মাধ্যমে। তার ঠাকুরদা জমিদার বীরেন্দ্র সিংহ নিয়োগী ১১ বছর লক্ষ্ণৌতে গোলাম আহমেদ খাঁ'র কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন এবং পিতা দিলীপ সিংহ নিয়োগী তার পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অমর সিংহ নিয়োগীর জন্মের ১ বছর পূর্বে ঠাকুরদা ও জন্মের ৪ মাস পর পিতার মৃত্যু হওয়ায় সঙ্গীতে তার হাতেখড়ি হয় তার জ্যাঠামশয়ায় জমিদার অনন্ত সেনের কাছে। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধকালীন অনন্ত সেন নিখোঁজ হওয়ার পর তার তবলা শিক্ষা শুরু হয় টাঙ্গাইলের শ্রী সুবীর কর্মকারের নিকট। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাফির চাকরি নিয়ে তিনি ময়মনসিংহ চলে যান। সেখানে তিনি প্রখ্যাত ওস্তাদ পবিত্র কুমার দেব– এর নিকট তবলা শিক্ষা শুরু করেন। ১৯৭৬-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার নিকট তবলা শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি টাঙ্গাইলে চলে আসেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি টাঙ্গাইলের সুকণ্ঠী গায়িকা ইতি নিয়োগীকে বিয়ে করেন। সঙ্গীত সাধনার নতুন দ্বার খুলে যায়। তাবে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে সঙ্গীতে, ছোট মেয়ে নৃত্যে ও ছেলে তবলা বিষয়ে তাদের সাংস্কৃতিক পরিবারের প্রকাশ বহন করে চলেছে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ স্ত্রী ইতি নিয়োগী টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদন করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তবলা প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার সেগুনবাগিচা 'তবলা শিক্ষালয়ে' বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তবলার ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনির নিকট তবলা শিক্ষা শুরু করেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ওস্তাদজীর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওস্তাদজী তাকে পুত্রসম স্নেহ

করতেন এবং অমর সিংহ নিয়োগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তবলা শিক্ষাকেন্দ্রেও তার আশির্বাদ বর্ষিত করেন। অমর সিংহ নিয়োগী শিষ্য হিসেবে যতটা সফল, শিক্ষক হিসেবেও ততটাই সফল। অমর সিংহ নিয়োগীর ছাত্ররাই তবলা বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণসহ জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। টাঙ্গাইলে তবলা বিষয়ের জাতীয় পুরস্কার অর্জন ইতিহাসে যা জ্বলজ্বল করছে। তার অন্যতম সেরা ছাত্র বিকাশ চন্দ্র বসাক ৫ বার স্বর্ণপদক ও তার একমাত্র পুত্র অমর সিংহ নিয়োগী স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় **১ম** স্থান অধিকার করেছে। তিনি তার নিরলস শ্রম ও ঐকান্তিক ইচ্ছা দ্বারা প্রতিটি ছাত্রকেই তাদের প্রতিষ্ঠিত হবার পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া বাংলা জার্মান সম্প্রীতি, আনন্দ সঙ্গীত একাডেমি, মাওলানা ভাসানী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি তবলা শিক্ষকরূপে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। বর্তমানে তার নিজস্ব স্কুল 'সুরছন্দা একাডেমি' তে শিক্ষাদান করছেন।

টাঙ্গাইলে তার তবলা বিষয়ে প্রভূত অবদান থাকা সত্ত্বেও তিনি এ জগত থেকে অন্তরালে অবস্থান করছেন।

তবে অন্তরালে থেকেও থেমে নেই তার তবলা সাধনা। তার গুরু কামরুজ্জামান মনির দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। তার সব অপ্রাপ্তি পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারই উত্তরসুরি একমাত্র পুত্র।

ফারুক কোরেশী

অভিনেতা, পরিচালক ও সংগঠক

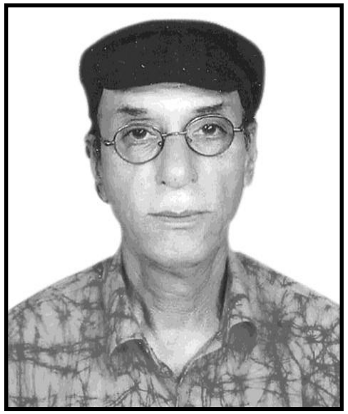

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক ঐতিহ্যবাহী, উদারপন্থি পরিবারে যিনি বেড়ে ওঠেন এবং যার শিশু কাল থেকে কৈশোরে পা রাখতেই কানে বাজতো সেতারের সুর আর তবলার বোল তিনি হলেন ফারুক কোরেশী। এমন সংস্কৃতিমনা মানুষের জন্ম ভারতের আলীগড়ের **১৯৪৪** খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই। পিতা আব্দুল হামিদ কোরেশী। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। আর মাতা নার্গিস হামিদ ছিলেন কুমুদিনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। ফারুক কোরেশী তিন ভাই বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

তার শৈশবে লেখাপড়ার সূত্রপাত হয় বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি **১৯৬১** খ্রিস্টাব্দে একই বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন ঢাকার তেজগাঁও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে। **১৯৬৭** খ্রিস্টাব্দে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। কিন্তু তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে সুনাম অর্জন করেন। টাঙ্গাইল যারা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করতেন তার মা-বাবার সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। আর সে কারণেই তিনি গান-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

তিনি **১৯৬০** খ্রিস্টাব্দে একজন সফল তবলাবাদক হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি শুধু তবলাবাদকই ছিলেন না, তিনি নাটকে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। তার পরিচালিত নাটকে টাঙ্গাইলের শুধু নয় ঢাকা চলচ্চিত্রের নামকরা প্রথিতযশা ও নাট্যশিল্পীরা অভিনয় করেছেন। তার নির্দেশিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, শাস্তি, মেরাজ ফকিরের মা, এই দেশে এই বেশে, এখন দুঃসময়, ইডিপাস, কৃতদাসের হাসি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দিকে যেমন তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি তিনি কর্মজীবনেও করেন। তিনি **১৯৮৮** খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবন শুরু করেন হুন্দাই কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে। এখানে বেশ কিছুদিন কর্মরত থাকার পর তিনি আবার যোগদান করেন যমুনা সেতুর টোল বিভাগে। **১৯৭৪** খ্রিস্টাব্দে শবনম পারভীনের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসার জীবনে দুই পুত্রের আদর্শ জনক। প্রথম পুত্র সাজিদ কোরেশী ঢাকার ওয়ান ব্যাংকে কর্মরত এবং দ্বিতীয় পুত্র নাশিদ কোরেশী বর্তমানে ঢাকার এনসিসি ব্যাংকের প্রধান শাখায় আইটি বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত।

তিনি টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমি, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের আজীবন সদস্য ও বর্তমানে কার্যনির্বাহী সদস্য।

আলমগীর খান মেনু

বিশিষ্ট রাজনীতিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আলমগীর খান মেনু। শুধু রাজনীতিকই নন, সাহিত্য সংস্কৃতির আলোয় এক আলোকিত মানুষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের এক লড়াকু সৈনিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন এক সংগ্রামী পুরুষ। ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ বৃস্পতিবার ১ জানুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের থানাপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. দেলোয়ার আলী খান ছিলেন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার। মাতা শামসুননেসা খানম।

তিনি বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করেন । ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর সা'দত কলেজে ইন্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে পর্যায়ক্রমে ইন্টারমিডিয়েট এবং বিএসসি পাস করেন। এরপর আবার এম এম আলী কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর নারায়ণগঞ্জ ল কলেজ থেকে ল' পাস করেন।

স্কুলে অধ্যয়নকালেই রাজনীতি শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে তিনি অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই ছাত্রলীগে জড়িত হন । প্রথম টাঙ্গাইল ছাত্রলীগ সাতজনে গঠন করেন। তার মধ্যে ছিলেন আলমগীর খান মেনু, ফজলুর রহমান খান ফারুক, আল মুজাহিদী, সিজান মামা, আলী আজগর খান দাউদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মোহন (খোয়াড়পট্টি)। সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গেই তারা জড়িত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শামছুল হকের উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ দফার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করার দাবিতে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি জেলা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং নির্বাচন উপলক্ষে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইলে জয়বাংলা শ্লোগান দেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলে নির্বাচন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জায়গায় ৯টি মুক্তিফৌজ দল গঠন করা হয়।

টাঙ্গাইল ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ৭১এর ২৩ মার্চ বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় আলমগীর খান মেনু সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায় আলমগীর খান মেনু ও কাদের সিদ্দিকী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে শপথ গ্রহণ করেন। আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে আলমগীর খান মেনু কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্য টাঙ্গাইল ট্রেজারির তালা ভেঙ্গে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেন। এইসব অস্ত্র কাদের সিদ্দিকীর গাড়িতে তুলে দেয়া হয়। এরপর উপরের নির্দেশে বাংলাদেশ বর্ডার ক্রস করে যুদ্ধে ট্রেনিং নেয়ার জন্য ভারতে মাইনকার চর উপস্থিত হন। সেখান থেকে তুরার ভিআইপি ক্যাম্পে উঠেন। সেখানে শামসুর রহমান খানসহ কয়েকজন আরও এমপি ও জিয়াউর রহমান অবস্থান করেছিলেন।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলমগীর খান মেনুর বৈঠক হয়। জিয়াউর রহমান আলমগীর খান মেনুকে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ থেকে ৩০০ জোয়ানকে ভারতে ট্রেনিং-এর জন্য দায়িত্ব দেন। আলমগীর খান মেনু ৩০০ জোয়ানকে আনার জন্য আবদুল হাই-এর মাধ্যমে বাতেন এবং মোয়াজ্জেমকে পত্র পাঠান। পরবর্তীতে আলমগীর খান মেনু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জের মুজিববাহিনী গঠন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তাকে মুজিব বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ কাজের জন্য তিনি ভারতের খেড়াপাড়া ইন্ডিয়ান কাউন্সিলে সিকিউরিটির অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ শুরু করেন। টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ এবং সুনামগঞ্জের সমস্ত যুবকদের ভারতের বর্ডার থেকে সংগ্রহ করে খেড়াপাড়ায় নিয়ে আসেন। তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেন। যারা ম্যাট্রিক/এসএসসি পাস তাদেরকে মুজিববাহিনীর পক্ষ থেকে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য দেরাদুন পাঠানো হয়। বাকীগুলোকে খেরাপাড়া এবং ঢালুতে ট্রেনিং দেয়া হয়। পরবর্তীতে ট্রেনিং শেষে তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল পাঠানো হয়। তখন জামালপুর যুদ্ধ চলে এমন অবস্থায় সব বাহিনী নিয়ে আলমগীর খান মেনুসহ অন্যরাও টাঙ্গাইলে প্রবেশ করেন। মিত্রবাহিনীর আক্রমণে তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আলমগীর খান মেনু মুজিববাহিনীর প্রধান হিসেবে টাঙ্গাইলে দায়িত্ব পালন করেন। টাঙ্গাইল জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হন এবং সভাপতি হিসেবে পর্যায়ক্রমে ৩০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। সকল প্রকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রকাশ পায় এবং শহরের ছয়টি ইউনিয়নে হাজার হাজার মানুষ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। সেই অবধি টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গঠিত হয় এবং আলমগীর খান মেনু তখন থেকেই টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের সকল নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারপর সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৬০ দশকে টাঙ্গাইল জেলা সংস্কৃতিতে অবস্থান অনেকটা নাজুক ছিলো। মুসলমান শিল্পীদের নাচ-গান ছিলো না বললেই চলে। আইয়ুব খানের মার্শাল ল-এর পর রাজনীতির চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় আলমগীর খান মেনু এবং সহযোগীরা নববর্ষ রবীন্দ্র ও নজরুলের উপর গীতিআলেখ্য লিখে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন। নাটক করে গ্রামেগঞ্জে লাগাতার অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করেন। এইসময় তিনি নাট্যবিতান নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই থেকে নৃত্য এবং গানে বহু শিল্পী গড়ে উঠে এবং পাড়ায় পাড়ায় বহু ক্লাব গড়ে উঠে। এদের মধ্যে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তন্মধ্যে সুবিনয় দাস, জওশন খান, নূরুল ইসলাম, আবু মো. এনায়েত করিম, রতন অধিকারী, রতন চক্রবর্তী, ফারুক কোরেশী, তারাপদ দে, মিলন সরকার, আবদুর রহমান রক্কু, কাদের শাহ্, চান মোহন দাস, খোরশেদ আলম, অঞ্জলি দে, আব্দুল ওয়াহেদ লিচু, রবি বাবু, মোহাম্মদ আলী, সুধীর বাবু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখান থেকেই টাঙ্গাইলে আধুনিক সংস্কৃতির উত্থান। সাহিত্য অঙ্গনে ৬০ দশক থেকে আলমগীর খান মেনু লেখালেখি শুরু করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য, নৃত্য আলেখ্য ও নাটক লেখেন। তার একটি কবিতার বই 'সকল ক্ষুদ্র মিলে ধর ক্ষুদ্রের হাত' ছায়ানীড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার ৮-১০টি নাটকের স্ক্রিপ্ট রয়েছে, এর সবকটিই মঞ্চায়িত হয়েছে এবং দুটি পুরস্কারপ্রাপ্ত। নাটক পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে তিনবার পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি।

তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের আজীবন সদস্য, সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় সিডিসির দশতলা বিশিষ্ট মাল্টিভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করে ক্লাবের আর্থিক উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বহু দুস্থ শিল্পীকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনি ক্লাবের পক্ষে ক্লাবের বাইরে থেকেও আর্থিক সহযোগিতার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি নাট্যবিতানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি টাঙ্গাইল কবি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম বিভাগীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আহ্বায়ক ছিলেন। নাট্যবিতানের পক্ষ থেকে সারা জেলাব্যাপী ৭দিন যাবৎ সকাল ৯টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সকল বিষয়ের বিচারক টাঙ্গাইলের বাইরে থেকে এনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য ২৫ বছর চেম্বারের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি কমিউনিটি পুলিশ টাঙ্গাইলের উপদেষ্টা, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ঐক্য জোটের সভাপতি, টাঙ্গাইল নাগরিক কমিটির সভাপতি, থানাপাড়া পঞ্চায়েত কমিটির নির্বাহী সভাপতি, এসো মানুষের জন্য করি, টাঙ্গাইলের সভাপতি। তিনি টাঙ্গাইল জজ কোর্টে পাবলিক প্রসিকিউটর-পিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আলমগীর খান মেনু ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাহবুবা হাসনাত খানের সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সাংসারিক জীবনে এক পুত্র এক কন্যার জনক। পুত্র রূপক খান, কন্যা সঙ্গীতা খান।

হামিদুল হক মোহন

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক

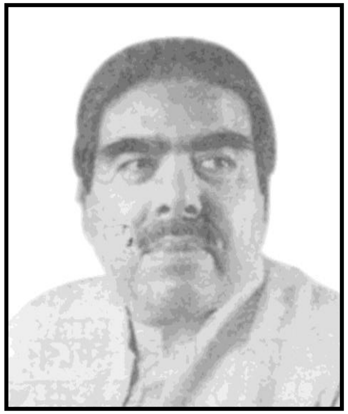

হামিদুল হক মোহন টাঙ্গাইল জেলার রাজনীতির অঙ্গনে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কথা বলার ভঙ্গি চমৎকার। হামিদুল হক মোহন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার মঙ্গলহোড় গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আইনউদ্দিন আহমেদ সুদীর্ঘকাল পাথরাইল ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন পাথরাইল ইউনিয়নের দেওজান সমাজকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও তিনি টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের আমৃত্যু সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু, সৎ এবং ন্যায়বিচারক হিসেবে সর্বত্রই সমাদৃত। হামিদুল হক মোহনের মাতার নাম হালিমা খাতুন।

তিনি টাঙ্গাইল হতে বাল্য শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিন্দুবাসিনী স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছাত্রদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তাকে জামুর্কী নবাব স্যার আব্দুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যেতে হয়। সেখানেও সকল বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সত্যিকারের মানুষ গড়ার কারিগর জিয়ারত আলী মাস্টার নিজে হামিদুল হক মোহনের দায়িত্ব নেন এবং জিয়ারত আলী মাস্টারের রুটিন মোতাবেক হামিদুল হক মোহন পড়ালেখা করেন। ফলে আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ ছাত্র হিসেবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি সা'দত কলেজ হতে এইচএসসি পাস করেন এবং একই প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকে রাজনৈতিক জ্ঞানে ঋদ্ধ ছিলেন।

সা'দত কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিপুল ভোটে এজিএস নির্বাচিত হন। মাওলানা ভাসানী ছিলেন তার রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা গুরু। মাওলানা ভাসানীর তিনি অত্যন্ত কাছের এবং প্রিয় মানুষ ছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। মাঝপথে জনগণের খেদমত করার জন্য বিআরডিবি টাঙ্গাইল এবং দেলদুয়ারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এলাকার সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে অদ্যাবধি জড়িত রেখেছেন। তিনি টাঙ্গাইল নাট্যমহলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সরগম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, বি.আর.ডি.বি. এবং বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদের

পরিচালক। এলাকায় শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য মঙ্গলহোর নিজ গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং টাঙ্গাইল টাউন প্রাইমারি স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি ফাজিলহাটি তমিজ উদ্দিন গার্লস হাইস্কুল, বরুহা হাইস্কুল, আটিয়া শাহানশাহী গার্লস হাইস্কুল, দেওজান সমাজকল্যাণ গার্লস হাইস্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। পাথরাইল ইউনিয়নের বেশির ভাগ রাস্তার উন্নয়ন এবং স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা পাকাকরণে তার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের হাই কমান্ডের একজন বলিষ্ঠ সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সরকারের অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেন। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে উপমন্ত্রীর মর্যাদায় 'দূতপুল'-এর সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বরাবরই আপোষহীন রাজনীতি করে এসেছেন। অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হামিদুল হক মোহন টাঙ্গাইল জেলার সর্বত্রই এবং সর্বমহলে একজন অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত।

তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভাষাসৈনিক শ্রমিক নেতা সৈয়দ আব্দুল মতিনের কনিষ্ঠ ভগ্নি নুরুন্নাহার পুটির সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে তিনি তিন কন্যা এবং দুই পুত্র সন্তানের আদর্শ জনক। তিনি টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সুদীর্ঘ ১৭ বছর এ দায়িত্বে থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রাখেন। পাশাপাশি টাঙ্গাইল জেলা পাটচাষী সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় তিনি বিশ্বাসী, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে আশাবাদী।

আব্দুর রহমান রক্কু

অনন্য নাট্যব্যক্তিত্ব

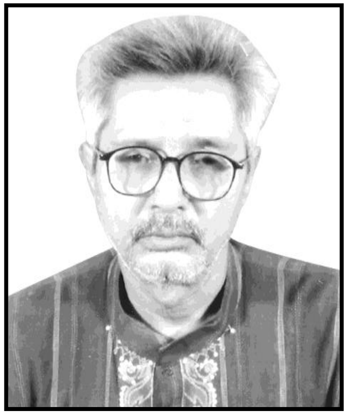

অনন্য নাট্যব্যক্তিত্ব আব্দুর রহমান রক্কু ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কালিহাতি উপজেলার দড়িখলিশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই যিনি টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে নাটকে অভিনয় শিল্পী হিসেবে জড়িয়ে পড়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন; তিনি হচ্ছেন টাঙ্গাইল জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুর রহমান রক্কু। পিতা হাজী মোহাম্মদ হোসেন ও মাতা রহিমান্নেছা। উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তিনি নিজ এলাকা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর টাঙ্গাইল শহরস্থ আলিয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল ও আলিম এবং বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ, করটিয়া হতে এইচএসসি পাস করেন। পরবর্তীতে বিএ ভর্তি হন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মঞ্চনাটকের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে মঞ্চনাটকে অভিনয় ও নির্দেশনার কাজ করেন। শতাধিক মঞ্চনাটকে অভিনয় করেন। কম, বেশি ৬০-৬৫টি মঞ্চনাটকে সফল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটকগুলোর মধ্যে 'চাক ভাঙ্গা মধু', 'কুমারখালীর চর', 'টিনের তলোয়ার', 'ইডিপাস', 'কিনো কাহারের থিয়েটার', 'ইবলিশ', 'ওরা কদম আলী', 'এখন দুঃসময়' ইত্যাদি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্যাকেজ মাধ্যমে অর্ধশতাধিক টেলিভিশন নাটকে অভিনয় এবং ২০টির মতো টিভি (ধারাবাহিক নাটকসহ) নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়া তিনি টাঙ্গাইলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। পাবলিক লাইব্রেরি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, শিল্পকলা একাডেমি, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, নাট্যবিতান, বহুবচন, কল্যাণ থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেন। দুই পথ, গুরুদক্ষিণা, শিক্ষক, প্রতিবাদসহ বেশ কয়েকটি মঞ্চনাটক রচনা করেন। প্রায় ৭ বছর ঢাকার প্রথম সারির নাট্যদল আরণ্যকের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি আরণ্যক নাট্যদলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। টাঙ্গাইল জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ১৫ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সহধর্মিণী নাজমা সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন। তিনি ১ ছেলে ও ৪ মেয়ের গর্বিত জনক ছিলেন। সন্তানেরা যথাক্রমে-১। মাহবুব রহমান শিল্পী, ২। শামছুল হক সাম্য, ৩। মাহবুবা রহমান সাথী (মৃত) ৪। মাকসুদা রহমান বীথি ও ৫। মোনালিসা রহমান শম্পা।

তিনি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সাযযাদ কাদির

কবি ও সাংবাদিক

সাযযাদ কাদির। সাংবাদিকতা ও লেখালেখি জীবনে এবং সুধী সমাজে এই নামে সুপরিচিত তিনি। তবে তাঁর পিতামহের দেয়া নাম শাহ নূর মোহাম্মদ। ডাক নাম বাবর। কবি, সাংবাদিক, ভাষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সংগঠক সব মিলে বহুমাত্রিক মানুষ। কৃতী ব্যক্তিত্ব সাযযাদ কাদিরের জন্ম ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেলদুয়ার গ্রামে। স্থায়ী আবাস টাঙ্গাইল শহরের আকুরটাকুরপাড়ায়। পিতা এস.এম আব্দুস সালাম ছিলেন ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জজকোর্টের সেরেস্তাদার। ছিলেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার জননন্দিত ফুটবলার, ঢাকা ও কলকাতায় সমান জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর। মাতা মাহমুদা বেগম ছিলেন পরহেজগার নারী।

সাযযাদ কাদির ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল শহরস্থ বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল থেকে মানবিক শাখায় এসএসসি পাস করেন। এইচ.এস.সি (ইন্টারমিডিয়েট) পাস করেন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ অনার্স এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু। মাসিক কণ্ঠস্বর-এর সহকারী সম্পাদক (১৯৬৬'৬৭), বিচিত্রার সহকারী সম্পাদক (১৯৭১-'৮৫), সাপ্তাহিক আগামী, পাক্ষিক তারকালোক, মাসিক কিশোর তারকালোক, মাসিক নিরিবিলি-এর সম্পাদক (১৯৮৫-৯২), দৈনিক দিনকাল-এর বার্তা/ফিচার সম্পাদক (১৯৯২-'৯৫) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খিস্টাব্দ পর্যন্ত করটিয়া সা'দত কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী সম্পাদক (প্রকাশনা ও ফিচার) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিটিভিতে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তাৎক্ষণিক (১৯৮২), প্রত্যয় (১৯৮৭), শাণিত সংকল্প (১৯৯২) রচনা ও পরিচালনা করেছেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ হতে রেডিও-টিভির অজস্র অনুষ্ঠান রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ডেস্কটপ পাবলিকেশনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। গণচীনের রেডিও পেইচিং-এর ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য, জাতীয় কবিতা পরিষদ, সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তা, আয়োজক বুধসন্ধ্যা-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক। প্রেসিডিয়াম সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সহযোগী সদস্য, সমালোচক সংঘ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়কারী হিসেবে জড়িত রয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির সদস্য ও সভাপতি ছিলেন তিনি।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে-কাব্যগ্রন্থ: যথেচ্ছ ধ্রুপদ, রৌদ্রে প্রতিধ্বনি, দূরতমার কাছে, দরজার কাছে নদী, আমার প্রিয়, এই যে আমি, কবিতা সমগ্র, জানে না কেউ, বৃষ্টি বিলীন; গল্পগ্রন্থ: চন্দনে মৃগ পদচিহ্ন, অপর বেলায়; গবেষণা গ্রন্থ: ভাষাতত্ত্ব পরিচয়, সহস্রক; শিশুতোষ গল্প : তেপান্তর, মনপবন, রঙবাহার, বীরবলনামা, এফফেনতি, উপকথন, রসচৈনিক: নানা রঙের দিন; টিভি নাটক: অপচয়ের যন্ত্রপাতি, সাড়ে সাতশ সিংহ, সমৃদ্ধ অসীম, আকাশ বাড়িয়ে দাও, টুনি' মওসুমি পাখিরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। একুশে স্মৃতি স্বর্ণ পদক-১৯৯৪ (সাহিত্যে), কবি জসীম উদ্দীন পুরস্কার-১৪০৪ (কবিতায়), শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বর্ণপদক-১৯৯৫ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব), নন্দিনী-২০০১ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সমগ্র ও কবিতা), কবি সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার-২০০২, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত সৈয়দ আব্দুল মতিন স্বর্ণপদক-২০০২ (সাহিত্যে), জাতীয় প্রেস ক্লাব সংবর্ধনা-২০০৩, টিভি সাংবাদিকতার প্রবর্তক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ট্রাব এওয়ার্ড-২০০৩ (লাইফ টাইম এচিভমেন্ট ভিত্তিক এওয়ার্ড), সম্মাননা ও সংবর্ধনা, সাতক্ষীরা সাহিত্য একাডেমি-২০০৪ সহ আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস (১৯৮৪), জাতীয় কবি প্রতিনিধি হিসেবে ফার্স্ট সাউথ এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল অব সার্ক কানট্রিস-এর অংশগ্রহণের জন্য ভারত সফর করেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলে শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংগঠক, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যূত্থানের অন্যতম রূপকার ও সংগঠক, ১৯৭১-এর টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন তিনি। এ জন্য পাক হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী এবং বন্দীশিবিরে নৃশংসভাবে নির্যাতিত হন। ১৯৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম রূপকার তিনি।

সাযযাদ কাদির সংসার জীবনে ২ ছেলে শাহ হাসনাত জামিল রাজন, শাহ সাদ্দাম কাদির টুটেন ও ৩ মেয়ে সাবরিনা মমতাজ চমন, সেগুফতা মুশারত সায়মা ও সাকিবা আনজুম টুপুর-এর আদর্শ জনক। স্ত্রী আফরুনা বাবলি।

তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

খালেকুজ্জামান খান লাবু

প্রতিষ্ঠাতা
পিসি সরকার মেমোরিয়াল ম্যাজিক একাডেমি

খালেকুজ্জামান খান লাবু মুক্তচিন্তার মননশীল মানুষ। বাসাইল উপজেলার সম্ভ্রান্ত খান পরিবারে ১১ নভেম্বর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। পিতা আলহাজ এমদাদ আলী খান ছিলেন সৎ নিষ্ঠাবান পুলিশ কর্মকর্তা, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী, মাতা হামিদা খানম ছিলেন সুগৃহিণী।

তিনি হামিদা ভিলা, বিশ্বাসবেতকা সপরিবারে বসবাস করছেন। শৈশব থেকে খালেকুজ্জামান অত্যন্ত শৌখিন, ক্রীড়ামোদী। বাগান করা, পাখি পোষা তাঁর প্রিয় সখ। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা খালেকুজ্জামান স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেও কোনো চাকরিতে যোগদান না করে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি টাঙ্গাইল বাস মালিক সমিতির সম্পাদক ছিলেন। টাঙ্গাইল শৌখিন মৎস্য শিকারী সমিতির সম্পাদক ও টাঙ্গাইল ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল শিল্পকলা একাডেমি ও সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্য। নাট্যকর্মী ও ম্যাজিসিয়ান হিসেবে তিনি টাঙ্গাইলের সুপরিচিত মুখ। তিনি টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠা করেন পিসি সরকার মেমোরিয়াল ম্যাজিক একাডেমি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে নিশাত নাসরীন বেবির সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শিতা, সহনশীলতা ও সাম্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এস এম মহসীন

২০২০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত

শিল্পী মাত্রই তার শৈল্পিক সত্তার বিকাশ সাধন করে থাকেন বিভিন্ন মাধ্যমে– যেমন: গান, কবিতা, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি। এর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ আছেন যারা বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী, এস এম মহসীন তাদেরই একজন। যিনি একাধারে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা, নাট্য প্রশিক্ষক, বাচিকশিল্পী ছিলেন। মঞ্চ, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনসহ সবখানেই তার ছিল সফল বিচরণ। বাস্তববাদী অভিনয়ের একজন নিখুঁত শিল্পী হিসেবে পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। জীবনের প্রায় সবটুকু সময় শুধু নাট্যকর্মেই ব্যাপৃত থেকে সৎভাবে ও সততার সাথে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন এই গুণীশিল্পী। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, তার জীবনের পরম প্রাপ্তি। যুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের অনুমোদনে, দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন মুক্তিফৌজ শিবিরে উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়েছেন।

তার জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পিতার চাকরিস্থল লালমনিরহাট রেলওয়ে কলোনীতে। পৈতৃকনিবাস টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার খাগুটিয়ায়। পিতা মো. মাজম আলী। মাতা নূরজাহান বেগম। বাবার চাকরির বদলি এবং ছাত্র রাজনীতির কারণে তাকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়তে হয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ভারতের ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে ভারত সরকার অনুমোদিত স্নাতকোত্তর মানের তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারে চুক্তিভিত্তিক শিল্পী এবং বাংলা একাডেমিতে সংস্কৃতি অফিসার পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। এরপর পদোন্নতি পেয়ে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভাগের পরিচালক হন। এর পাশাপাশি তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন সময়ে একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ সহ সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছর নিষ্ঠার সাথে একাডেমির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি নিয়মিত অভিনয়শিল্পী এবং নাট্যকর্মী ও নাট্য প্রশিক্ষক। মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন চ্যানেল ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি ফিল্ম ও টেলিভিশন মাধ্যমের উপর ভারতের পুনা ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে চার মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম প্রকল্প পরিচালক।

তিনি প্রকল্প দলিল প্রণয়ন ও সরকারের অনুমোদন গ্রহণসহ এর সফল বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং সাংগঠনিক রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা: তিনি প্রবাসী সরকারের অনুমোদনে, দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন মুক্তিফৌজ-শিবিরে উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গঠিত, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্যতম প্রধান নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও শিল্পী। সংস্থাটি মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় সক্রিয় ছিল এবং এ সময়ে ২ ও ৩নং সেক্টরের অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শরণার্থী শিবির, যুব শিবির ও জনসমাগমস্থলে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানস্থলগুলোর মধ্যে রয়েছে– বিশাল গড়, হাতিমারা, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর লেম্বুচূড়া, দূর্গা চৌধুরী পাড়া, বাগমাড়া, আম্পিনগর, গোকুলনগর ইত্যাদি। এ সংস্থায় কিছুকাল থেকে বাংলাদেশের অনেক বরেণ্য শিল্পী পরবর্তীতে কলকাতায়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন।

ছাত্র জীবনে তিনি শায়েস্তাগঞ্জ হাইস্কুল, হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ও নরসিংদী কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে বিভিন্ন গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বেগম ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন, ৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর ডাকসু ও জাতীয় নির্বাচন, **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ: একজীবনে এর সবটুকুই তার গৌরবোজ্জ্বল ও পরম প্রাপ্তি হিসেবে আজন্ম স্মরণীয়।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, অবিভক্ত ঢাকা মহানগর-এর প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

নাট্যকর্ম সম্পৃক্ত অন্যান্য পরিচয়: তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সাবেক খণ্ডকালীন শিক্ষক (১৯৯১-২০০৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের নাটক বিষয়ের বহিস্থ প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা ও পরিশোধক ছিলেন। জাতীয় গণ মাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো)-এ, বাচনিক শিল্প (Voice) এবং মন-মনযোগ ও শরীর শিথিলকরণ বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বেসরকারি পর্যায়ের নাট্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'থিয়েটার স্কুল' এবং 'নাট্যশিক্ষাঙ্গন'-এর নিয়মিত প্রশিক্ষক ছিলেন। নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি একজন আবৃত্তি শিল্পী ও আবৃত্তি প্রশিক্ষক ছিলেন। স্বাধীনতার পর **১৯৭২** খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মঞ্চায়িত ' কেউ কিছু বলতে পারে না' নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এ নাটকে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা ও পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে নন্দিত অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ কামাল। তিনি গ্রুপ থিয়েটার আদর্শের নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে ঢাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত 'ড্রামা সার্কেল'-এর সক্রিয় সদস্য। স্বাধীন

বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চার পথিকৃৎ 'নাট্যচক্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই), বাংলাদেশ কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন। অভিনয় শিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন মঞ্চ, বেতার এবং বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিশেষ শ্রেণি) নিয়মিত অভিনয় এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে অনিয়মিত অভিনয় করেন।

তার উল্লেখযোগ্য টেলিভিশন নাটকের মধ্যে রয়েছে– রক্তভেজা শাপলা, আমি-তুমি-সে, শুকতারা, বেলা-অবেলা, গরম ভাত, নিছক ভূতের গল্প (মেরিল প্রথম আলো শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার-২০০৭), বাড়াবাড়ি, সাকিন সারিসুরী, কোথায় সে জন, দখিন দুয়ার খোলা, ক্যাই ফিশ, ছেঁড়া জুতা, মোহর আলী, মারমেইড, এভারেস্ট, শেষ দৃশ্যে দেখুন, রেড এলার্ট, একটা কিনলে একটা ফ্রি, ভাওয়াল সন্ন্যাসী, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, বৈকুণ্ঠের উইল, ডিবি, দেনা-পাওনা, বিদায় অভিশাপ, নিষ্কৃতি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ডালিয়া, হৈমন্তি, মুক্তির উপায়, মধ্যবর্তিনী, মণিহার, মোহমায়া, রাসমণির ছেলে, আপদ, গুপ্তধন, একজনমে, ভাঙনের শব্দ শুনি, বউমণি, সাতকাহন, শহর থেকে দূরে, চন্দ্রবতী, আবার সর্বনাশ, আয়নার গল্প, অশিক্ষিত, পঁচাশির বারান্দা, অন্যজীবন, সেই মানুষটি, তার তার মুক্তি, সুস্ত্রীয় তুমি, বিয়ে হবে, স্মার্ট হাউজ, মায়াজাল, পাতলা খান লেন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনেক অনেক বিশ্ব নাটকসহ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রায় দুইশতাধিক নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন । বাংলাদেশ বেতারেরও বিশেষ মানের অভিনয় শিল্পী তিনি। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বেতার নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন।

মহসীনের নাট্যজীবন শুরু হয় মঞ্চ নাটক দিয়ে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চায়িত তার মঞ্চনাটকগুলো হলো– টিপু সুলতান, মসনদের মোহ, মীর কাশিম, সিতাহরণ, রামের সু মতি, রাস্তার ছেলে, মন্টুর পাঠশালা, ছোটদের সিরাজদৌলা, কালিন্দী, কুয়শা কান্না, পাথরবাড়ি, দুই পুরুষ, অনেক তারার হাতছানি, মায়াবী প্রহর, ছয়ে ছয়ে চার, কবর, দায়ী কে, কফি হাউজ, উল্কা, রাজনন্দিনী (যাত্রাপালা), চোর, বারোঘণ্টা, ক্ষুধা, লালন ফকির, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, সূযমহল, চিঠি, এক নদী রক্ত (মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নাটক-**১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিলো), পাথরবাড়ি, হিংসার পরিণাম, (যাত্রাপালা), পেন্ডুলামের খুন, কেউ কিছু বলতে পারে না, জলে ধোয়া স্নিগ্ধ হাত চাই, শাহজাহান, যেবার পতন, চুপ আদালত চলছে, চাঁদ বণিকের পালা, বিবি সাব, উদয় নালা, দীপান্তর (শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য স্বর্ণপদক লাভ-**১৯৭৩** খ্রিস্টাব্দ)। তার অভিনীত মঞ্চ নাটক শতাধিক।

বাংলাদেশের বাইরেও বিদেশে তিনি বাংলা নাটক মঞ্চায়ন করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– নরওয়ে ও সুইডেন (দি প্রিন্স এন্ড দি জায়েন্ট), ইংল্যান্ড, লন্ডন ও ম্যানচেস্টার (নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ), ভারত, দিল্লী, কলকাতা, আগ্রা, আগরতলা, উদয়পুর, বিলোনিয়া (কবর, কেউ কিছু বলতে পারে না, বিদগ্ধ রমনী কূল, তৈল সংকট, সুবচন নির্বাসনে, আয়নার সামনে চড়ুই পাখি, এক্সরে, চাঁদ বণিকের পালা ইত্যাদি।

হিন্দি ভাষার নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– মিট্টিকা গাডি (মৃচ্ছ ফটিক), সখারাম বাইন্ডার, জুলি, নিশাচর, এক সত্য হরিশ চন্দ্র, টু একজিকিওশনার্স, দি লাভার্স, দান্তো কাম উত, বিচ্ছু, লাইলি-মজনু (নৌটংকী) ইত্যাদি।

তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে: দুই জীবন, জনম-দুখী, গেরিলা, অনিল বাগচীর একদিন, আখি ও তাঁর বন্ধুরা, দরিয়া পাড়ের দৌলতী, দমকা, বৃহন্নলা, নুরু মিয়া ও তার বিউটি ড্রাইভার, গেরিলা, গোর, সূতপার ঠিকানা, সূচনা রেখার দিকে, আসমানী, চিরঞ্জীব মুজিব, সূচনা রেখার দিকে, হাডসনের বন্দুক, সাপলুডু, রোহিঙ্গা, জয়নগরের জমিদার, গাঙচিল, কাঁটা দি ফিল্মসহ বেশ কিছু পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

তিনি টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ (টেনাসিনাস)-এর সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত, বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন শিল্পী সংস্থার জ্যেষ্ঠ সদস্য। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, অভিনয় শিল্পী সংঘ, ডিরেক্টর গিল্ড, প্রডিওসার এসোসিয়েশন, টেনাসিনাস এবং রোসিনাস-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আয়োজিত নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রাবন্ধিক, আলোচক, সভাপতি, বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি হিসেবে নাটক ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা: তিনি বাংলা একাডেমির ফেলো। দীর্ঘদিন জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সহ-সভাপতি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদ। উপদেষ্টা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম। নির্বাহী সদস্য, আন্তর্জাতিক নজরুল চর্চাকেন্দ্র। উপদেষ্টা, ভারতে উচ্চ শিক্ষা লাভকারী বাংলাদেশের শিক্ষার্থী সমিতি। উপদেষ্টা, পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন।

নাটক সম্পৃক্ত বিদেশ ভ্রমণ: কলকাতা, দিল্লী, চন্ডিগড়, উজ্জয়ন, আগ্রা ও মুম্বাইসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় নাটক এবং নরওয়ে ও সুইডেন এবং লন্ডনসহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বাংলা নাটক মঞ্চায়ন করেন। আমেরিকান থিয়েটার দেখার লক্ষ্যে মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি, পিটসবার্গ, লুইসভিলি, সিয়াটল এবং নিউইয়র্ক সিটি পরিভ্রমণ করেন। জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়, উন্নত থিয়েটার মঞ্চের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে এসব বস্তুগত সুবিধাদি যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করণের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড সফর করেন।

অনুভবী চেতনা, বিশ্বাসী প্রেরণা ও প্রয়াসী বৈশিষ্ট্য: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঙ্গলিক আদর্শ, কল্যাণ-ভাবনা, কালজয়ী দেশপ্রেম, সিংহ-হৃদয়, দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব, অমিত সাহস, দূরদর্শিতা, মমত্ববোধ, দেশের মানুষের প্রতি অবিচল আস্থা ও ভালোবাসায় বিশেষভাবে অনুরক্ত এবং এ মহামানবের কিঞ্চিৎ সাহচর্যে ধন্য।

আজীবন সৎ থাকার প্রচেষ্টা এবং এর ফলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যৎসামান্য হলেও একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। তিনি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সাথে অব্যাহতভাবে যুক্ত থাকার প্রচেষ্টা করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সকল কর্মকে সর্ব উচ্চে স্থান দেয়া।

নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মের বিশেষায়িত বিষয়াদি: বাচনভঙ্গী, স্বরসাধন ও স্বরপ্রক্ষেপণ, মন ও মনোযোগ। শরীরী ভাষা ও যোগাসন। নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণ। চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরিত্র নির্মাণ। আবৃত্তি। তাৎক্ষণিক অভিনয় ইত্যাদি।

অনন্য স্মরণীয় স্মৃতি: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের কাল রাতে (আনুমানিক রাত দশটা থেকে রাত সাড়ে দশটা) ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কাজী ফিরোজ-অর রশীদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয় তার। জানামতে, এরপর সে রাতে আর কারও পক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (সম্ভবত ১৭ তারিখে), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে মুস্তফা জব্বাবের (আইটি বিশেষজ্ঞ) রচনা ও আফতাব আহমেদের (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য) নির্দেশনায় মঞ্চস্থ ‘এক নদী রক্ত’ নাটকে অংশগ্রহণ। এতে বঙ্গবন্ধুর প্রতীকী চরিত্রে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বৈরশাসক মিলিটারি জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়ার চরিত্রে অভিনয় করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলাদেশে আসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ড কেনেডিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের উপস্থিতিতে পরিবেশিত গীতি নকশার ধারা বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আলবদরের হাতে নৃশংসভাবে নিহত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শহিদ মুনীর চৌধুরী, শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও শহিদ আনোয়ার পাশাসহ সকল শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে মিরপুরের বধ্যভূমিতে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ড. নীলিমা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী জনাব মতিউর রহমানকে, শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু শহিদ বুদ্ধিজীবী বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান হিসেবে মঞ্চায়িত ‘কবর’ নাটকের প্রধান চরিত্রে (নেতা) অভিনয়। শহিদ মুনীর চৌধুরী অনূদিত ‘ কেউ কিছু বলতে পারে না’ (জর্জ বার্নার্ড ’শ রচিত ইউ নেতার ক্যান টেল-এর বাংলা অনুবাদ) নাটকটি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতায়, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায় মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। নাটকের অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন তাহমিদা সাঈদা (শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ছোট বোন), ফেরদৌসী মজুমদার, শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে), আসলাম ভূঁইয়া (প্রাক্তন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। বাংলাদেশের কোনো নাট্যদলের এটিই ছিল প্রথম বিদেশ সফর। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি প্রযোজিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বুড়ো শালিকের ঘাঁড়ে রোঁ’ নাটকে ভুক্ত প্রসাদ চরিত্রে প্রধান কুশীলব অভিনয় করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত জাতীয় সাহিত্য

সম্মেলনের সাংস্কৃতিক উপকমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভারতের এনএসডি থেকে নাটক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত প্রথম কোনো নাট্যকর্মীর বাংলাদেশে ফিরে আসা এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে, নাটকের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাট্য শিক্ষাঙ্গণে প্রশিক্ষিত শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মের শুরু।

দেশীয় নাট্যকর্মী হিসেবে সর্বপ্রথম নাট্যকর্মশালা পরিচালনা (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে): ফেনী মহকুমা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ফেনীতে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থানায় ময়মনসিংহে। বাগেরহাট মহকুমা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় বাগেরহাটে। ঢাকাসহ সারাদেশে প্রয়োজনা কেন্দ্রিক নাট্য কর্মশালাসহ নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিস্তৃতকরণ। উপযুক্ত নাট্যকর্মীদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতীয় বৃত্তির অধীনে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ এবং বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তাদেরকে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় যাত্রা উৎসব, জাতীয় নাট্যোৎসব, জাতীয় লোকনাট্য উৎসব, মূকাভিনয় উৎসব, আবৃত্তি উৎসবসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ প্রকল্পের ধারণাপত্র ও প্রকল্প দলিল প্রণয়ন এবং এতে বিভিন্ন আধুনিক বস্তুগত সুবিধা অন্তর্ভূক্তকরণসহ এর সফল বাস্তবায়নে সক্রিয় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ: তিনি একুশে পদক-২০২০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'উপাচার্য স্বর্ণপদক' (নাটক: তারাশংকর রচিত 'দীপান্তর')। আজীবন কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে 'শিল্পকলা পদক'-২০১৭ লাভ। বাংলা একাডেমি প্রদত্ত সম্মানসূচক ফেলোশিপ-২০১৮। মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার-২০০৭ (সেরা টিভি অভিনয় শিল্পী-পুরুষ। নাটক: 'গরম ভাত' ও 'নিছক ভূতের গল্প')। ইকবাল হোসেন স্মৃতি স্বর্ণপদক-২০০৭। অমলেন্দু বিশ্বাস স্মৃতি পদক। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ প্রদত্ত গোলাম মোস্তফা স্মৃতি পুরস্কার লাভ। অভিনয় শিল্পীসংঘ প্রদত্ত আজীবন সদস্য সম্মাননা। সুন্দরম সম্মাননা পদক, হবিগঞ্জ। দীপালোক সাংস্কৃতিক সংসদ সম্মাননা পদক। নাট্যসভা বরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্মাননা পদক। বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম সম্মাননা পদক। শায়েস্তাগঞ্জ থিয়েটার পদক, শায়েস্তাগঞ্জ। প্রাকৃতজন পুরস্কার, বগুড়া। আবৃত্তি শিল্পী গোলাম মুস্তফা পদক লাভ করেন।

পারিবারিক জীবন: তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে জাহানারা মহসীনের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের সংসারে বড় ছেলে এসএম রেজওয়ান মহসীন প্রকৌশলী, বড় ছেলে বউ ফারহানা ইয়াসমিন। ছোট ছেলে এসএম রাশেক মহসীন– ছোট ছেলের বউ ফারহানা আফরোজ; নাতিন তাসমিয়া মহসীন এবং নাতি তাহমিদ মহসীন ও তাশফীন, রাশতান মহসীন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মামুনুর রশীদ

নাট্যব্যক্তিত্ব

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

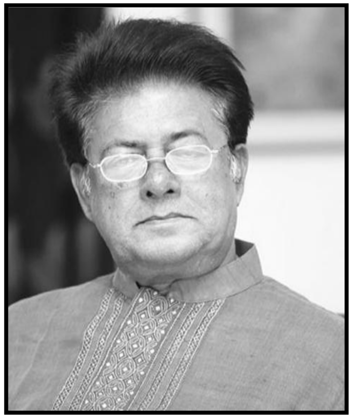

মামুনুর রশীদ। দেশের শীর্ষ নাট্যব্যক্তিত্ব। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে অগ্রণীজন। লেখা ও অভিনয়ে হাত ধরাধরি করে পথ চলা তাঁর। যেন সমানে সমান। নাটক লেখেন সামাজিক অঙ্গীকার থেকে, পথ চলার চেষ্টা করেন প্রগতির আদর্শে। ভদ্র লোকাচারের আড়ালে নষ্টতাকে তুলে আনেন লেখনীতে। কথা বলেন মানুষের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে। গুণী অভিনেতা মামুনুর রশীদ একজন নাট্য নির্দেশক। বর্তমানে চেয়ারম্যান, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। তির্যক ক্ষুরধার সংগ্রাম তাঁর। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান হাজারো অসঙ্গতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম তাঁর। কপটতার প্রতি বরাবর রক্তচক্ষু। তিনি মানুষের জন্য রচনা করেন শিল্প-'শিল্পের জন্য শিল্প নয়। তাঁর মাঝে আড়াল নেই। কথা সোজা-সাপটা, অকপট। নাটক রচনা, অভিনয় ও নির্দেশনায় বরাবর নিবেদিত প্রাণ মামুনুর রশীদ-এর জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঘাটাইল উপজেলার ভাবনদত্ত গ্রাম।

দাদা এলাহি বক্স খান ছিলেন সরল-সাধারণ উদার প্রকৃতির, ভাবুক। পুঁথি লেখক হিসেবে পরিচিত। লোক-সাহিত্য গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সংগ্রহে তাঁর রচিত একাধিক পুঁথি রয়েছে।

বাবা হারুন অর রশীদ খান ছিলেন পোস্ট মাস্টার। সৎ ও শিক্ষানুরাগী। স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণার আলোকিত মানুষ। মা রোকেয়া খানম গৃহবধূ।

বাবার চাকরির সুবাদে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মামুনুর রশীদের লেখাপড়া শুরু। হাইস্কুলে পড়াশুনা এলেঙ্গা ও বল্লা স্কুলে। এস.এস.সি পাস করেন ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বল্লা করোনেশন হাইস্কুল, কালিহাতি হতে। তারপর ভর্তি হন কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে। পাস করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। বি.এ ও এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ নেশা ও পেশা হিসেবে বেছে নেন লেখালেখি ও অভিনয় জীবনকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পেরিয়ে অদ্যাবধি তিনি অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছেন, প্রশিক্ষক-নির্দেশক ও প্রযোজক হিসেবে কাজ করে চলেছেন তিনি। মঞ্চ ও টিভি নাটকে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি, গুণী ও শক্তিমান অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃত। মঞ্চে অভিনীত এবং বই আকারে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য

নাটক সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ পশ্চিমের সিঁড়ি (১৯৭১), গন্ধর্ব নগরী (১৯৭৫), ওরা কদম আলী (১৯৭৬), ওরা আছে বলেই (১৯৭৮), ইবলিশ (১৯৮১), গিনিপিগ (১৯৮৩), অববাহিকা (১৯৮৬), লেবেদেব (১৯৯৫) ও সংক্রান্তি (২০০১)।

উল্লেখযোগ্য টিভি নাটক : এখানে নোঙর, ইতি আমার বোন, একটি সেতুর গল্প, সময় অবসর (ধারাবাহিক), শিল্পী (ধারাবাহিক), ইতিকথা (ধারাবাহিক), সুপ্রভাত ঢাকা (খণ্ড নাটক), দানব (ধারাবাহিক), সুন্দরী (ধারাবাহিক), স্বপ্নের শহর (ধারাবাহিক), সোয়াত, ওম, লাল মিয়ার ডিউটি, নিউইয়র্কের সুজা ভাই, মোহর আলীর বিষয় আশয়, জিম্মি, হানিফ খাঁ, ধরিত্রী (টেলিফিল্ম), এল.বি.ডব্লিউ (টেলিফিল্ম) একটি মৃত্যু ও একটি গল্প।

তাঁর লেখা একাধিক নাটক বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। নাট্য লেখক, নির্দেশক, নাট্য প্রশিক্ষক, সমন্বয়কারী হিসেবে নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক দেশে ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে জাপান, হংকং, জার্মানি, তাইওয়ান, কানাডা, দ. কোরিয়া উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ রেডিও-তে নাট্য রচয়িতা এবং অভিনেতা হিসেবে যুক্ত তিনি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন। বিভিন্ন ফিচার ও ডকুমেন্টারি রচনা ও নির্দেশনার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নাট্যলেখক, অভিনেতা, সংগঠক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি নাট্যকার পদকপ্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, দেশে স্বৈরশাসক থাকায় সে পুরস্কার প্রত্যাখান করেন তিনি। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর, ইনডিজিনিয়াস পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন কানাডা, ইসি মেম্বার, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সেন্টার, চিফ সেক্রেটারি, আরণ্যক নাট্যদল।

মামুনুর রশীদের স্ত্রী গওহর আরা চৌধুরী। একটি প্রডাকশন হাউসের ফিন্যান্স ডিরেক্টর। সংস্কৃতিমনা, মুক্ত চিন্তার অধিকারী। পারিবারিক জীবনে তাঁরা এক কন্যা ও এক পুত্রের জনক-জননী।

কন্যা শাহানাজ মামুন। স্কুল শিক্ষিকা, বিবাহিতা। স্বামী-কাজী জওয়াত। ছেলে- আদিবুর রশীদ মামুন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ভিজ্যুয়াল আর্ট-এর ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আম্বিয়া নূরী

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

মুক্তচিন্তার সৃজনশীল মানুষ গোলাম আম্বিয়া নূরী টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক ধ্রুব নক্ষত্র। তার জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল ধনবাড়ি উপজেলার মুশুদ্দি ইউনিয়নের বলিভদ্র গ্রামে। পিতা খান সাহেব আলহাজ ডা. বছির উদ্দিন আহমেদ ছিলেন সহকারী সিভিল সার্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাতা আলহাজ লতিফুননেছা চৌধুরাণী। দশ ভাই চার বোনের মাঝে তিনি দশম। টাঙ্গাইলের মুক্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শৈশব- কৈশোরে অবাধ বিচরণ।

শৈশবে টাঙ্গাইল শহরে লেখাপড়া শুরু। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে ছাত্রজীবনের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, সেন্টগ্রেগরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন শেষে বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাস করেন। সা'দত কলেজে স্বল্পকাল অধ্যয়ন। এরপর করাচি থেকে এফএসসি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এম এম আলী কলেজ, কাগমারী হতে এইচএসসি, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এম এম আলী কলেজ কাগমারী হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের প্রারম্ভেই তিনি পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়যোদ্ধা হিসেবে কাদেরিয়া বাহিনীর সিগন্যাল কোরের সদস্য ছিলেন। তাকে সিগন্যাল কোরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দলের কাছে যেতে হয়। এ সময় কালীগঞ্জ, নাগরী, বাড়িবাড়ি, নরুন বেলাইবিল প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংযোগ রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। যুদ্ধে যুদ্ধে নয়মাস অতিবাহিত হয়। লালসবুজের পতাকা হাতে ফিরে আসেন স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলায়।

কর্মজীবন: করাচি থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে শর্ট ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে তিনি ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যুত্বান নামক তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ঢাকাস্থ বাংলা মটরে 'অডিও ইন্টারন্যাশনাল' নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। নূরী ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি প্রা. লি. প্রতিষ্ঠান স্বল্পকাল পরিচালনা করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের চেয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সফল বিচরণ। 'স্রোত' নামক এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাককে চেক কাপড় সাপ্লাই দিতেন। সৃজনশীল এই মানুষটি ব্যবসায়ও মননশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার সৃষ্টি 'মিঠাই' নামক মিষ্টি। বিত্ত নয় চিত্তের জন্যেই তার জীবনের

পথ চলা। একসময় ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে লেখালেখিতে তিনি মনোনিবেশ করেন। সময় সভ্যতা এবং নাটক নামক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। প্রাচীন ভারতের নাটক, 'বাংলায় নাটক' প্রাচীন থিয়েটার স্থাপত্য ও উপাত্ত 'নাটকের অভিধান' 'নাটকের কৌশল' এসকল গুরুত্বপূর্ণ নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে।

পারিবারিক অধ্যায়: সহধর্মিণী বেগম আয়শা হেনা নূরী সুগৃহিণী, সুখময় সংসারে দুই কন্যা এক পুত্র। বড় কন্যা সুলতানা আফরিন নূরী UDA-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ম্যানেচস্টারে বসবাস করছেন। কনিষ্ঠ কন্যা ড. সুলতানা নাসরীন নূরী ভূতত্ত্ব অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একমাত্র পুত্র গোলাম কিবরিয়া নূরী, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় প্রজেক্ট ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সামাজিক সম্মাননা-স্বীকৃতি: ছাত্রজীবন থেকেই আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। সংবাদ পাঠক হিসেবেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা নাট্যোৎসবে প্রথম স্থান লাভ করে। 'কুমারখালির চর' জাতীয় নাট্যোৎসবেও শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে 'লবঙ্গ দেশের কথা' জাতীয় শিশু নাট্যোৎসবে প্রথম স্থান লাভ করে। 'আধপোড়া শানকি' বিটিভিতে মঞ্চনাটকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে মঞ্চায়িত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

বিদেশ ভ্রমণ: ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা (মায়ানমার), তাইওয়ান, হংকং, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা: করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের আজীবন সদস্য। তিনি পৃথিবী নামক গ্রহের সদস্য। তিনি গড়ে তুলেছেন পৃথিবীর ইতিহাস সংগ্রহশালা। তিনি পৃথিবী নামক পাঠশালার শিক্ষার্থী।

সাক্ষাৎকারে গোলাম আম্বিয়া নূরী বলেন, আমাদের নব প্রজন্মকে বইমুখী করে তুলতে হবে। মানুষ যদি পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হন তবে তার জাগতিক সকল দুশ্চিন্তা কমতে থাকে। যে মানুষের জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ থাকে তিনি প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে পারেন। তিনি গড়তে পারেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বৈশ্বিক চেতনার মানুষ পৃথিবীকে সাজাতে পারেন নতুন আঙ্গিকে। সংস্কৃতির আলোয় স্বচ্ছ মানুষ পৃথিবীকে দীপ্তিময় করেন। তিনি হন নির্মল চিত্তের, তিনি হন নির্ভীক, তিনি হন দুর্জয়।

আরেফিন বাদল

বরেণ্য লেখক, সম্পাদক ও
প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

দেশের বিনোদন ম্যাগাজিনের সফল সম্পাদক ও টিভির প্যাকেজ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আরেফিন বাদল ঘাটাইল উপজেলার উজ্জ্বল নক্ষত্র।

বাংলাদেশে যে কয়জন প্রতিষ্ঠিত লেখক রয়েছেন, আরেফিন বাদল তাদের একজন। একাধারে তিনি সাংবাদিক, গবেষক। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই ব্যক্তিটির জন্ম টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার পোড়াবাড়ি গ্রামে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর। পিতা শাহ বাহা উদদীন, মাতা সা'রা খাতুন।

তিনি ঘাটাইল উপজেলার পাকুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি, মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, কাগমারী হতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি, একই কলেজ হতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকরি লাভের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু। তবে স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে চাকরির বন্ধনে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নিরলস শ্রমে প্রতিষ্ঠিত বিনোদনধর্মী পত্রিকা 'পাক্ষিক তারকালোক' প্রকাশ করেন। তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। একই গ্রুপ থেকে প্রকাশ পায় কিশোর তারকালোক ও সাপ্তাহিক আগামী। পত্রিকা তিনটির প্রধান সম্পাদক তিনি।

এছাড়া আগামী, তারকালোক প্রকাশন লিমিটেড, আরেফিন বাদল ট্রাস্ট, সাইট এন্ড সাউন্ড, এটিপিপিএল প্রিন্টিং ডিভিশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য, ১৯৯৪-৯৯ পর্যন্ত টেলিভিশন প্যাকেজ প্রোগ্রাম মেকার্স ফোরামের সভাপতি ছিলেন, বাংলাদেশ লেখক সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্য তিনি, বাংলাদেশ পিরিয়ডিক্যাল নিউজপেপার সোসাইটির সদস্য, বাংলা মঞ্চের নির্বাহী সভাপতি তিনি, ন্যাশনাল ফিল্ম এওয়ার্ড জুরিবোর্ডের সদস্যসহ আরও অনেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

তিনি একজন কাহিনিকার, নাট্যকার, লেখক, প্রযোজক ও পরিচালক। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও রেডিওতে নাটকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। তার লেখা অনেক গ্রন্থ পাঠকসমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এরমধ্যে- প্রসবোম্মুখ যন্ত্রণাবিদ্ধ (গল্পগ্রন্থ), আগামীকাল ভালোবাসার (গল্পগ্রন্থ), নিত্যদিন কালগোনা (গল্পগ্রন্থ), নিসর্গের সন্তানেরা (উপন্যাস), ইমুবাবু (উপন্যাস), ঐ আসে আমীর আলী (উপন্যাস), রবীন্দ্রনাথের জীবনে নারী (গবেষণা গ্রন্থ), ঐতিহাসিক প্রেমপত্র (গবেষণা গ্রন্থ), অন্তর বর সাজা (শিশুতোষ) উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য মাওলানা ভাসানী পদক লাভ করেছেন ও ফজলুল হক স্মৃতি লাভ করেছেন।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে জার্মানি, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, চিন এবং ভারত সফর করেছেন।

স্ত্রী রীতা আরেফিন ছিলেন তারকালোকের আরেক নক্ষত্র। যিনি অকাল প্রয়াত। পুত্র ইমন আরেফিন পিতার সুযোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে প্রতিশ্রুতিশীল।

দিলওয়ার হাসান

বরেণ্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কর্মগুণে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে ওঠেন। এমন একজন কর্মবীর সু-পুরুষ, কবি, গল্পকার, গীতিকার, আবৃত্তিশিল্পী, আবৃত্তি সংগঠক ও অভিনেতা এবং উপস্থাপক দিলওয়ার হাসান। তিনি ১ মে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার শিয়ালকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদর। মাতার নাম মোছাম্মৎ জয়নাব বেগম। কবি দিলওয়ার হাসানের পুরোনাম মো. দিলওয়ার হোসেন তালুকদার। তিনি সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে দিলওয়ার হাসান নামে পরিচিত।

শিক্ষাজীবন: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) ভূঞাপুর সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি নেন। তারপর ভূঞাপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। এরপর কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কারণে বিজ্ঞান বিভাগ পরিবর্তন করে ভূঞাপুর ইবরাহীম খাঁ কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হন এবং এইচএসসি পাস করেন। তারপর করটিয়া সরকারি সা'দত কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে বিএ পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন।

পেশা: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) পিএসসি কর্তৃক মনোনীত হয়ে বাংলাদেশ বেতার-এ অনুষ্ঠান প্রযোজক পদে ১৭ অক্টোবর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে যোগদান করেন। পরে বাংলাদেশ বেতার ঢাকায় অনুষ্ঠান সংগঠক, সহকারী আঞ্চলিক পচিালক ও উপ-পরিচালক হিসেবে ২৬ বছর কাজ করেন।

সাংস্কৃতিক জীবন: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) কিশোরবেলা থেকেই গান, কবিতা ও গল্প লিখেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি আবৃত্তি শিল্পী হিসেবেও পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াবস্থায় স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' নামে আবৃত্তি ও সঙ্গীতালেখ্য গ্রন্থনা, অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করেন। আবৃত্তির শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে বিশেষ কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে নজরুল জয়ন্তী বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারে প্রথম অংশ নেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি আবৃত্তি, ধারা বর্ণনা এবং কয়েক বছর ধরে বাহিক 'এই ঢাকা, সেই ঢাকা' প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে ধারা বর্ণনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশনে প্রচারিত

বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে ধারা বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন ছাড়াও ইরানের তেহরান বেতার কেন্দ্র থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ও ফররুখ আহমেদের একাধিক কবিতার আবৃত্তি তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ প্রচার হয়।

সৎগঠক: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নবীন ও প্রবীন আবৃত্তি শিল্পী ও কর্মীদের একত্রিত করে বাংলাদেশে প্রথম আবৃত্তি সংগঠন 'আবৃত্তি সংসদ' গঠন করে আবৃত্তি করে মর্যাদাবান শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। দিলওয়ার হাসান ১৯৫১-২০১৪) বাংলাদেশের প্রথম আবৃত্তি সংগঠক। এই সংগঠনের মাধ্যমে ড. মো. মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় 'হাজার বসন্তের ফুল' নামক অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও অংশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের ছয়জন আবৃত্তি শিল্পীর অংশগ্রহণে পারস্পরিক নির্দেশনায় কৃষ্ণ চরিত্রে কণ্ঠাভিনয় করেন। যুগলডানায় সোনালী সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা করেন ও যুগল আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে অংশ নেন। এরকম বহু অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়ে সু-খ্যাতি অজ্র্ন করেন।

উপস্থাপক: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) একজন সফল উপস্থাপক হিসেবে সুনাম কুড়িয়ে ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে শিলাইদহ উন্মুক্ত মঞ্চে দুইবার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। ত্রিশালে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি শিখা অনির্বাণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কোর ঘোষণার পর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে নয়াপল্টনে সরকারি আনন্দ উৎসবে লক্ষ শ্রোতার সামনে অনুষ্ঠান উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের প্রায় শুরু থেকে তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানগুলোর উপস্থাপন করেন। ঢাকাতে টাঙ্গাইল জেলা সমিতির সকল অনুষ্ঠানের প্রায় পঁচিশ বছর উপস্থাপনা করেছেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল ইবরামীম খাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালনে ঢাকা ভূঞাপুরের দু'একটি বাদে প্রায় সব অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেছেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সার্ক সম্মিলন। এই অনুষ্ঠানের বহিঃপ্রচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

কণ্ঠের উপাধি: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) সুকণ্ঠের জন্য স্বর্ণকণ্ঠ উপাধি পান। এই উপাধিটি দেন অধ্যাপক এসপি দেব, সঙ্গীত পরিচালক গোলাম মোস্তফা, সঙ্গীত পরিচালক আব্দুল আজিজ বাচ্চু, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সমর দাস প্রমুখ। তাঁকে কণ্ঠরাজ বলে ডাকেন চলচ্চিত্র পরিচালক হাফিজ উদ্দীন। ম্যাজিক ভয়েস বা যাদুকণ্ঠ আখ্যা দেন প্রফেসর মোবাশ্বের আলী।

বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা: দিলওয়ার হাসন (১৯৫১-২০১৪) রেডিও ম্যাগাজিন উত্তোরণ, দর্পণ, আনন্দধারা (অধুনালুপ্ত), মহানগর ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনা, প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা, রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী ও মৃতুবার্ষিকীতে অনেক আলেখ্যনুষ্ঠান

গ্রন্থনা এবং ধারাবর্ণনা ও আবৃত্তিতে অংশ নেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাঙলাদেশ বেতারে নাটক ও আবৃত্তিতে বিশেষ গ্রেড, বেতারে নাট্যকার ও নাট্য প্রযোজক হিসাবে 'ক' গ্রেড এবং বেতার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রযোজনায় দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে খন্দকার রেজাউল করিমের একটি কথিকাকে আলেখ্যানুষ্ঠানে রূপ দিয়ে প্রযোজনা ও অংশগ্রহণ করেন। দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে প্রচারিত বহু অনুষ্ঠানে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পরিবেশন করেছেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠানে গ্রন্থনা, বর্ণনা ও প্রযোজনা করেন। খন্দকার আনোয়ারুল হক মেঘদুতের মৃত্যুতে বিশেষ অনুষ্ঠান গ্রন্থনা, বর্ণনা ও প্রযোজনা করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত নাটক 'বসন্তের দিনরাত' রচনা, প্রযোজনা ও মূলচরিত্রে অভিনয় করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে 'দোলায়িত বৃক্ষের সবুজে' বেতার নাট্যরূপ, প্রযোজনা ও মূল চরিত্রে অভিনয় করেন। বাংলাদেশ বেতার ঢাকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, আবৃত্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাণী ও ছন্দ পরিকল্পনা ও প্রযোজনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ বেতার ঢাকায় রাত ১০টায় ইবরাহীম খাঁ রচিত নাটক 'কামাল পাশা' প্রচারিত হয়। এই নাটকের বেতার নাট্যরূপ, প্রযোজনা ও কামালপাশার মূল চরিত্রে অভিনয় করেন।

মঞ্চ ও টেলিভিশনে অভিনয়: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় অধ্যক্ষ এ.জেক.এম. আমিনুল ইসলামের নির্দেশনায় শিশুশিল্পী হিসেবে মনোনীত হন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'অনুবর্তন' নাটক (আকাব ইবনে সাইখ লিখিত) পরিচালনা ও মূলভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর কলেজের প্রদীপ শিখা নাটকে প্রদীপের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক ও সুধিমহলে আলোচিত হন। সা'দত কলেজে 'পাথর বাড়ি' নাটকে ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে অবাক করে দেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নায়ক আব্দুর রহমান পরিচালিত একটি ছায়াছবির জন্য দিলওয়ার হাসানকে মনোনীত করেন।

চিত্রনায়িকা শাবানা প্রযোজিত ছায়াছবির জন্য আমন্ত্রণ পেলেও বেতারের চাকরির ব্যস্ততায় সাড়া দেননি। চিত্রপরিচালক এফ. কবীর চৌধুরী দিলওয়ার হাসানকে অভিনয় করিয়ে একটি আর্ট ফিল্ম প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মৃত্যুর জন্য করা সম্ভব হয়নি। তবে এফ. কবীর পরিচালিত ত্রিদেশীয় দুটি ছায়াছবি নীল দরিয়া ও এক, দুই, তিন ডাবিং-এ কণ্ঠাভিনয় করেন। বাংলাদেশে টেলিভিশন নাটকে বিশেষ অডিশন দিলে আব্দুল্লাহ আল মামুনের বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে টেলিভিশনে প্রথম অভিনয় করেন। এর ক'মাস পরেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে টেলিভিশনে প্রথম অভিনয় করেন। এর ক'মাস পরেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলাদেশ বেতারে নাটকে অডিশন দিয়ে নাট্যশিল্পীর তালিকাভূক্ত হন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহসিন হলের নাটক সিরাজ হায়দার রচিত ও পরিচালিত 'বিয়ে আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন' এ মূল ভূমিকায় মাত্র একদিনের মহড়ায় অভিন করে আলোড়ন সৃষ্টি করার পর নাটক শেষে সে রাতেই কয়েকটি সামাজিক ছায়াছবির জন্য আমন্ত্রণ পান। ২০০০

খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে নাট্যশিল্পী হিসেবে সর্বোচ্চ বিশেষ গ্রেড পান।

পুরস্কার: বেতার অনুষ্ঠান 'দর্পণ' শ্রেষ্ঠ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাচসাস পুরস্কার পান।

প্রকাশিত গ্রন্থ: ১. বরাদ্দভূমি এবং পুষ্পবৃষ্টি (স্ব-কণ্ঠ কাব্য ক্যাসেট)- ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ। ২. আদিম সৈকতে (গল্পগ্রন্থ)- ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। ৩. দোলায়িত বৃক্ষের সবুজে (কাব্যগ্রন্থ) ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। ৪. বসন্তের দিনরাত (নাটক) ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ। ৫. প্রতিদিন সুখে-দুখে প্রিয় অঞ্জলিকা (গানের বই)- ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

আবৃত্তি ক্যাসেট ও সিডি: দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) বাংলাদেশের প্রথম ক্যাসেট কাব্য প্রণেতা। ছাপার বিকল্পে বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বকণ্ঠ কাব্য তাঁরাই। দিলওয়ার হাসানের স্বকণ্ঠের কাব্য ক্যাসেটের নাম (১) বরাদ্দভমি ও পুষ্পবৃষ্টি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বের করেন। প্রযোজনায় ছিলেন ভূইয়া নাসির উদ্দিন। (২) প্রথম পার্থ: ছ'জন আবৃত্তি শিল্পীর কণ্ঠাভিনয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বের করেন। (৩) তোমার কাছে যাবো-যুগল আবৃত্তি ক্যাসেট কাব্য। আবৃত্তি শিল্পীদ্বয় হলেন– দিলওয়ার হাসান (১৯৫১-২০১৪) ও মুনাওয়ার সুলতানা। ক্যাসেট ও সিটি প্রযোজনা কমিটমেন্ট। এই কাব্য ক্যাসেটটি ১৪টি দেশে বাজারজাত হয়েছে।

প্রকাশিত্যগ্রন্থ: ১. উড়াল (গল্প)। ২. ঠাঁই (উপন্যাস)। ৩. দুয়ার (স্মৃতিচারণ আত্মরাজবৈনিক) তিন খণ্ড। প্রথম খণ্ড: দুয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড: কুসুমের ভোর, তৃতীয় খণ্ড: স্রোত। ৪. চিঠি ও কথামালা (পত্রাবলী ও প্রবন্ধ)।

এই গুণী আবৃত্তিশিল্পী, গীতিকার, নাট্যকার, কবি ও সাহিত্যিক গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেলায়েত হোসেন খান নান্টু

বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলায়েত হোসেন খান নান্টু ৩০ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার মশদই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রাব উদ্দিন খান, মাতার নাম নূরজাহান খানম।

তিনি বিকম পাস করে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে বিএডিসির চাকরিতে যোগদান করেন। সে সময় তিনি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নওয়াজিশ আলী খান নামে এক নানার বাসায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকরিতে বহাল থেকেও মুক্তিবাহিনীকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন এবং বাতেন বাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি পুনরায় চাকরিতে বহাল হন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে একাউন্টস অফিসার হিসেবে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে 'ট্রাস্ট মিডিয়া' নামে একটি প্রোডাকশন হাউজের ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান: বেলায়েত হোসেন খান ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকবাহিনী কর্তৃক যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রান্ত হয়। তিনি তখন সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি পরিবারের অন্যদের নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের উপর তলায় আশ্রয় নেন। বর্বর পাক বাহিনী সেই হাসপাতালেও গণহত্যা চালায়। তবে উপর তলায় অপারেশন না করায় ভাগ্যগুণে তারা বেঁচে যান। তিনি চাকরিতে বহাল থেকে সাটুরিয়ায় বাতেন বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ছুটি নিয়ে ঢাকার খবরাখবর মুক্তিবাহিনীকে পৌঁছে দেন। ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজে তিনি একাধিকবার পাকবাহিনীর তল্লাশির মুখোমুখি হন এবং আল্লাহর রহমতে রক্ষা পান। নভেম্বর মাসের পর তিনি সরাসরি মুক্তিবাহিনীতে সক্রিয় হন। তবে তার পক্ষে সরাসরি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

সাংগঠনিক তৎপরতা: তিনি অনেক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ম্যানেজিং পার্টনার-ট্রাস্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটি কমান্ডার বিএডিসি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুরঙ্গনা ললিতকলা একাডেমি, গুলশান, ঢাকা, ভাইস চেয়ারম্যান নিরাপদ সড়ক চাই- কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি– ব্যতিক্রম-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও প্রাতভ্রমণ সংগঠন, সহসভাপতি- টেলিভিশন দর্শক ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটি, সদস্য- গুলশান হেলথ ক্লাব, উপদেষ্টা-

যুগান্তর থিয়েটার, সদস্য– টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রডিউসার এসোসিয়েশন, সদস্য- এ্যাক্টরস ইকিউরিটি, আজীবন সদস্য– মির্জাপুর উপজেলা কল্যাণ সমিতি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: তিনি একজন দক্ষ অভিনেতাও। তার অভিনীত মঞ্চনাটক- বঙ্গে বর্গী, মীর কাশেম, ধর্মবল বা বিজয়িনী, মা মাটি মানুষ, একটি পয়সা, বৌদির বিয়ে, বিশ বছর আগে, সিঁদুর নিওনা কেড়ে, এক মুঠো অন্ন চাই, টিভি নাটক- বাল্যবিবাহ ঠাট্টা, সময়ের কালস্রোত, টিভি সিরিয়াল- ইনসান শালা দুলাভাই, চা চিনি দুধ, ছায়াছবি- দোস্ত দুশমন, বারুদ, কুয়াশা, সূর্যগ্রহণ, রক্তের সীমানা, দুই ভাইয়ের যুদ্ধ, ইজ্জতের লড়াই ও বিদ্রোহী পদ্মা ইত্যাদি।

পারিবারিক অধ্যায়: তার স্ত্রী কামরুন্নাহার ইনভায়রনমেন্টাল ওয়াটার স্যানিটেশন হাইজিন এডুকেশন এন্ড হেলথ স্পেশালিস্ট অব ইউনিসেফ। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। একমাত্র পুত্র তাহরিম খান নিবিড় এমপিএ অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন– শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দিতে হবে।

এলেন মল্লিক

গণসঙ্গীতশিল্পী

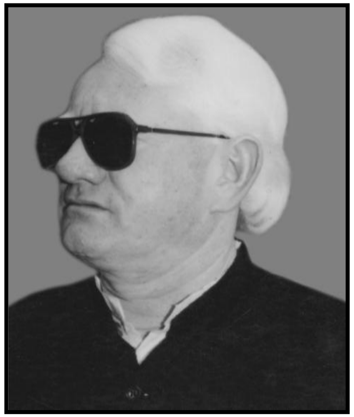

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যাঁরা এ দেশকে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাদেরই একজন এলেন মল্লিক। এই বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের কহেলা গ্রামে ৩ মার্চ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। পিতা হাবিবুর রহমান মল্লিক ও মাতা মনোয়ারা বেগম। টাঙ্গাইল শহরের আলো বাতাসে বেড়ে ওঠেন। বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাস করেন। প্রতিভাদীপ্ত এই মানুষটি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৭৬-৭৭ ব্যাচে B.Mus. কোর্স সমাপ্ত করেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র নয় বছর বয়সে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট তবলা ও বেহালাবাদক ওস্তাদ আবুল হোসেনের কাছে এলেন মল্লিকের তবলায় হাতেখড়ির মাধ্যমে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ। ইতোমধ্যে একজন ভালো তবলাবাদক হিসেবে স্থানীয়ভাবে তার প্রসার লাভ করে এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনের খ্যাতনামা শিল্পীদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে তার সঙ্গীত জগতের দ্বার আরো বিষদভাবে উন্মোচিত হয়।

১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তার ছিলো সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর মধ্যে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের 'মান্না দে' খ্যাত কণ্ঠশিল্পী বাবু রতন চক্রবর্তীর কাছে এলেন মল্লিক কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নেওয়া শুরু করেন এবং এরই ধারাবাহিতায় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের আগরতলা, মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও মুজিবনগরস্থ বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পীর সাথে অনেক অনুষ্ঠানে জয়বাংলা সঙ্গীত দলের একজন নিয়মিত সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় তিনি যাদের নিকট থেকে সঙ্গীত বিষয়ক তালিম নিয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রতিম বারীন মজুমদার, ওস্তাদ আকতার সাদমানী, নারায়ণ চন্দ্র বসাক, নিতাই রায়, ফজলে নিজামী, মৃন্ময় দাস গুপ্ত, আফসারী খানম, অজিত রায়, আবদুল লতিফ, ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি, সুখেন্দু চক্রবর্তী, ওস্তাদ আবিদ হোসেন খান, ওস্তাদ কালু মিয়া, শেখ লুৎফর রহমান, ওস্তাদ মো. হোসেন খান, আতিকুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও যাদের সহযোগিতায় তিনি এই জগতের সাফল্য লাভ করেছেন তাদের মধ্যে আবদুল আলিম,

খন্দকার ফারুক আহমেদ, মো. আবদুল জব্বার, মো. আলী সিদ্দিকী, রেজা মজিদ, আপেল মাহমদু অগ্রগণ্য।

তিনি পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত ও কালজয়ী শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ছোটবেলা থেকে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে একজন সফল সংগঠক ও একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যুক্ত ছিলেন। যার ধারাবাহিকতা ও আজও বিদ্যমান। এলেন মল্লিক পাকিস্তান ও ভারতের যেসব শিল্পীদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেহেদী হাসান, গোলাম আলী, ফরিদা খানম, ওস্তাদ আমানত আলী, নাজাকাত আলী, ওস্তাদ সালামত আলী, ফতেহ আলী, ওস্তাদ নাত্থু খান, মুন্নী বেগম, ওয়ালী মো. বালুচ, মোহাম্মদ আলী, ওস্তাদ সাকোয়াত আলী হোসেন খান, ওস্তাদ মোবারক আলী, ধীরেন বসু, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, ঋতুগ্রহ, শ্যামল মিত্র, প্রশন ব্যানার্জী, মীরা ব্যানার্জী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, দ্বীপালী নাগ, অংশুমান রাগ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, মান্না দে, ওস্তাদ আল্লারাখ্খা খাঁ, পারভেজ কোরেশী, নাঙ্কু মহারাজ, রাধাকান্ত নন্দী, চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন, গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, ভূপেন হাজারিকা, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, শৈলজ রঞ্জন মজুমদার, পূর্ণদাশ বাউল, মঞ্জুদাশ বাউল, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম।

বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন নিয়মিত তালিকাভূক্ত কণ্ঠশিল্পী তিনি। তিনি গণসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি, হাছন রাজার গান প্রভৃতি ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় মুজিবনগরস্থ জয় বাংলা সাংস্কৃতিক দলের একজন নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। তাদের কণ্ঠে দেশাত্ববোধক গান শুনে অন্যরাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে।

বিক্ষুব্ধ সঙ্গীত শিল্পীগোষ্ঠীর আহ্বায়ক হিসেবে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ টাঙ্গাইল জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত বিশাল অনুষ্ঠানে আবদুল লতিফ সিদ্দিকী প্রধান অতিথি এবং আলমগীর খান মেনুর সভাপতিত্বে পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশাল জনসমাবেশে সঙ্গীত দলের নেতৃত্বের অগ্রভাগে ছিলেন এলেন মল্লিক।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল কনসেপ্টের 'শোষিতের গণতন্ত্র চাই' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সেদিনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে এলেন মল্লিকের নেতৃত্বে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

২৯ জুন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মানিক মিয়া এভিনিউতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশাল জনসভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার সেলের সাংস্কৃতিক উপপরিষদের সদস্য হিসেবে সারা দেশে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মশাল র‌্যালির সাথে গণসঙ্গীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সারাদেশ ভ্রমণ করেন। পরামর্শক সভ্য, জাতীয় গণসঙ্গীত পরিষদ। ঢাকা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র

কল্যাণ কমিটির আহ্বয়ক হিসেবে তার নেতৃত্বে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দুই দিন ব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যা বিটিভি ও বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময় তিনি নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকেছেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক সদস্য সচিব। মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কমান্ড, কেন্দ্রীয় কমিটি, জয় বাংলা সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা-এর সাবেক সহ-সভাপতি। বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা-এর সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক। জয়বাংলা সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় সংসদ এর নির্বাহী সদস্য। সাবেক ভিপি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ছাত্র সংসদ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জননেতা আব্দুল মান্নান স্মৃতি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য। প্রথম আলো বন্ধুসভা, টাঙ্গাইল জেলা শাখার উপদেষ্টা। বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, টাঙ্গাইল জেলা শাখার অন্যতম সহ-সভাপতি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, টাঙ্গাইলের নির্বাহী সদস্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল-এর আজীবন সদস্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। এছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতি জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল জেলা শাখার আজীবন সদস্য, এফপিবিএ ও জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সভাপতি– মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, টাঙ্গাইল পৌর কমিটি। সাবেক সদস্য সচিব– কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমান্ড, উপদেষ্টা– শতদল সাংস্কৃতিক সংস্থা, শিল্প কল্যাণ সংস্থা, সাবেক আহ্বায়ক, টাঙ্গাইল জেলা সাংস্কৃতিক জোট। বর্তমানে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মৃত্তিকা বাংলাদেশ ঢাকা কর্তৃক ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্তিকা পদক লাভ করেন। আব্দুল আলীম পরিষদ কর্তৃক আবদুল আলিম সম্মাননা-২০১৩ লাভ করেন। বাংলাদেশ শিল্প-কৃষ্টি সংসদ কর্তৃক বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী স্বর্ণপদক-২০১৪ অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে লোকসঙ্গীত বিভাগের তালিকাভূক্ত কণ্ঠশিল্পী। একজন গণসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সারাদেশে তার একটা আলাদা অবস্থান রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলা সঙ্গীত ভূবনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত পরিবেশনে সব্যসাচী এই কণ্ঠশিল্পী সমান পারদর্শী।

সুখময় সংসার জীবনে সহধর্মিণী খালেদা মল্লিক। তার স্নেহধন্য কন্যা লাভলী সঙ্গীত শিল্পী (এলএলবি)।

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, সঙ্গীত জগতে সাফল্য লাভের জন্য সাধনার কোনো বিকল্প নেই।

সাজ্জাদ হোসেন খান

অভিনয় শিল্পী

দেলদুয়ার উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ডা. শাহাদৎ আলী খান ও সালেমা খাতুনের চতুর্থ সন্তান সাজ্জাদ হোসেন খান ১৯৫৩ সালের ৩০ এপ্রিল জন্ম তার। সাত ভাই চার বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় ভাই। বাবা সরকাি র চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে বগুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় তার বেড়ে ওঠা। ১৯৬০ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের বার্ষিক নাটক তার বাবার লেখা ও পরিচালনায় 'সংঘাত'-এ শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম নাটকে প্রবেশ। এরপর ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বার্ষিক নাটক তার বাবার লেখা ও পরিচালনায় 'প্রতিশোধ'-এ অভিনয় করেন। ১৯৬৯ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ডাকসুর নাট্যচক্র থেকে 'লেট দেয়ার বি লাইট (আবার আলো দাও)', 'নবান্ন', 'কিংশুক যে মরুতে' নাটকের মধ্য দিয়ে আবার অভিনয় জগতে শুরু হয় তার পথ চলা। ১৯৭৪ সালে থিয়েটার নাট্য গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য হয়ে 'এখন দুঃসময়, সেনাপতি, দুই বোন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, ওথেলো, ম্যাকবেথ (নাগরিক ও থিয়েটার যৌথ প্রযোজনায়) নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভূক্ত অভিনয় শিল্পী। টিভিতে তার অভিনীত আমাদের 'সন্তানেরা, অস্থির পাখিরা, প্রথম প্রহর, জন্মভূমি, সেই তুমি, স্বর্ণমৃগ, নদী উপাখ্যান, পলাশ ডাঙার মাঝি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ধারাবাহিক নাটক 'সকাল সন্ধ্যা' আনোয়ারা-তে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এতো বছর পরেও তার অভিনীত নাটকগুলোর অভিনয়ের কথা টিভি দর্শক প্রশংসার সাথে আলোচনা করে থাকেন।

টেলিভিশনের সত্তর দশকের সফল ও জনপ্রিয় এই অভিনেতা 'মোহনা', 'তোলপাড়', 'তাসের ঘর' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। মঞ্চ নাটক নিয়ে থিয়েটার নাট্য গোষ্ঠীর সাথে দেশের বিভিন্ন জেলায় নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়া নাটক নিয়ে থিয়েটারের সাথে ভারত সফর করেন এবং কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চেও অভিনয় করেন। ৫টি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এর মধ্যে আমরা দু'জন ড্রাইভার প্রশংসিত। বাংলাদেশ বেতারে তার অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে সমাপ্তি। অন্য রকম রক্তাক্ত কারবালা। নাট্যকার হিসেবে তার রচিত আত্মপ্রত্যয়, উপলব্ধি, নাটিকা বাবার স্বপ্ন (৬ পর্ব) প্রচারিত হয়।

বর্তমানে অসুস্থতার কারণে নাটক থেকে দূরে সরে আছেন। তবে বাংলাদেশ বেতারের নাটকে মাঝে মধ্যে অভিনয় করে থাকেন। তার একমাত্র কন্যা সন্তান সাইমা খান আমেরিকা প্রবাসী। স্বামী সন্তান নিয়ে স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। দু'তিন বছর পরপর ঢাকায় এসে বাবার সাথে সময় কাটিয়ে যান। এছাড়া ভিডিও কলে সব সময় অসুস্থ বাবার খবরাখবর নেন। মেয়ের শাসনে বাবাও মুচকি হাসেন।

অবসর সময়ে বই পড়া, নাটক, কবিতা, গল্প লেখা আর টিভি দেখে সময় কাটান। ক্রিকেট পাগল এই অভিনেতা টিভিতে খেলা থাকলে সব কিছু ভুলে যান।

ঢাকায় ফ্রি স্কুল স্ট্রিট কাঁঠাল বাগানের 'সালেমা কটেজ' পৈতৃক ভিটায় ৬ তলা ভবনের ষষ্ঠ তলায় স্থায়ী বাস। বিশেষ করে ছাদ বাগান তাকে দিয়েছে নতুন জীবন। দশ বারো বছরের ছাদ বাগানে গাছ লাগানো, পরিচর্যা, পানি দেওয়া, ছাদ পরিষ্কার রাখা সবই তার তদারকে হয়। শাক-সবজি, বিভিন্ন ফল-ফসল বাড়ির সব সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে আনন্দ পান। তার বাগানের বারো মাইসা আম, আনার, জলপাই, কামরাঙ্গা, জামরুল, মালটা, কমলা, করমচা, বড়ই, আতা, সফেদা, লেবু উল্লেখযোগ্য। তার ছাদ বাগানের ফল সবজি নিয়মিত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও মালিদের মাঝে বিলিয়ে দেন। এলাকার সবার কাছে সে একজন প্রিয় ব্যক্তি।

হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে গ্রীন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি হন। আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় টানা চারদিন লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। খবর পেয়ে মেয়ে তার শিশু সন্তান ঐশীকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটে আসেন। সতেরো দিন পর হাসপাতালের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসার সব ব্যয় পরিশোধ করে তাকে বাসায় নিয়ে আসেন।

প্রায় এক মাস অসুস্থ বাবার পাশে ছায়ার মতো থেকে আবার ফিরে যান নিউইয়র্ক। এতোদিনে বাবা কিছুটা সুস্থ। আমরা তার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

হারুণ-অর-রশিদ

সম্পাদক, টাঙ্গাইল ক্লাব
দক্ষ সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

হারুণ-অর-রশিদ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ আব্দুল বারি এবং মাতা জীবননেছা বেগম। সাত বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থতম। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি টাউন প্রাইমারি স্কুল ও বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এবং পরে তিনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর মাওলানা মোহাম্মদ আলী মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন এবং সা'দত মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সম্মান ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই শাহানা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী শাহানা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিফার্ম ও এমফার্ম ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে টাঙ্গাইল প্রি-ক্যাডেট স্কুলে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। সংসার জীবনে এক পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র ডা. সামিউর রশিদ রিফাত সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে সরকারি চাকরি করছে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিষয়ে এমডি করেছে। কন্যা ডা. সায়রা জুয়াইরিয়া খুশবু, আলটাসনোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত। পুত্র বধূ ডা. সাবরিনা মাসুক ইভা, ঢাকা মেডিকেল থেকে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন। কন্যা জামাতা ডা. এম. কে. জামান, বর্তমানে EMO টাঙ্গাইল জেনারেল হসপিটাল।

তার কর্মজীবন ব্যবসা দিয়ে শুরু করেন এবং টেক্সটাইল মিল, রিফাত টেক্সটাইল (প্রা.) লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিডিএস যৌথ উদ্যোগে এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রায় এক যুগ সফলতার সাথে কাজ করেন। তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৬ বার সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল ক্লাবের ৭ বার সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল ক্লাবের ৭ বার সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে শুরু থেকে জড়িত আছেন। বর্তমানে উপদেষ্টা। তিনি নিবেদিতা সঙ্গীত একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা। সৌখিন মৎস্য শিকারী সমিতির দুই বার সাধারণ সম্পাদক, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের সভাপতি, টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের সভাপতি, বিভিন্ন সংগঠনের উপদেষ্টা ও জাতীয়

সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ভুটান, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভারত, চায়না, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বালি, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, মালদ্বীপ, মায়ানমার, সিকিমসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে শাহীন কলেজ, মাওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। প্রিয় শখ: ভ্রমণ, গানশোনা এবং বইপড়া।

শঙ্কর রায়

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা

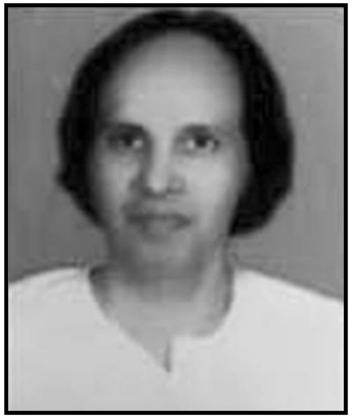

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদক। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন শুধু তাদেরই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি চালু রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় যারা এই পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ভাষাসৈনিক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম, কবি আল মুজাহিদী প্রমুখ। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করে এই সম্মাননা পেলেন শঙ্কর রায়। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং বহু সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা। তার জন্ম বাংলা ১৩৬২, ১০ কার্তিক (১৯৫৫ খ্রি.) টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার ভাদরা গ্রামে। বাবা সূর্য কান্ত রায়, মাতা অঞ্জলি রায়। তিনি শৈশবে পিতামাতার কাছে হাতেখড়ি নেয়ার পর ভাদরখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষা নেন। ধ্বনি রায় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং নাগরপুর কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু হারমোনিয়াম ছিলো না। খালি গলায় তিনি দিনের পর দিন বিভিন্ন রকমের গান গাইতে থাকেন। এক সময় অদম্য নেশার কারণে কুষ্টিয়া চলে যান। সেখানে কলকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর সুযোগ্য শিষ্য আব্দুল মোতালেবের কাছে দীর্ঘ ১০/১১ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন। সেই সাথে সঙ্গীতের তাত্ত্বিক বিষয় আয়ত্ত করেন।

এরপরের পর্ব সরাসরি রাজধানী ঢাকা। এখানে নিতাই রায়, নারায়ণচন্দ্র বসাক, কুটি মনসুর, সুবল দাস প্রমুখ সঙ্গীত সাধকদের সান্নিধ্যে আসেন। সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষা দান, গান রচনা, সুর সংযোজন, স্বরলিপি প্রণয়ন সবকিছু তিনি নিষ্ঠার সাথে করতে থাকেন। সঙ্গীতই তার ধ্যান এবং জ্ঞান। একসময় নিজের করা স্বরলিপি প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন মায়ের নামানুসারে 'অঞ্জলি প্রকাশনী'। এরপর একের পর এক তার বই প্রকাশ হতে থাকে। তার বইয়ের কম্পোজার তিনি নিজেই। প্রুফ দেখা, প্রচ্ছদ ডিজাইন সবই তার করা। বহু বছর ধরে তিনি সঙ্গীতাঙ্গনে সঙ্গীত শিক্ষার নানা ধরনের বই লিখে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে সঙ্গীত শিক্ষার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে শঙ্কর রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সঙ্গীতাঙ্গনের শিক্ষার্থীদের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার বইয়ের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। তার গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন রাগরাগিনী সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় প্রকাশিত। গ্রন্থসমূহে তিনি রাগের পরিচিতি, রাগআলাপ, তান, একাধিক খেয়াল, তারানা এবং বিলম্বিত খেয়াল তুলে ধরেছেন।

সঙ্গীত বিষয়ে তার ৪৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ রাগঅঞ্জলি, রাগমালা, রাগমিনতি, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সংগ্রহ, ভারতীয় প্রিয় আধুনিক গানের স্বরলিপি, সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি, লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি, সোনামণিদের ছড়াগান শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বরলিপি, ছোটদের স্বরলিপি সারেগামা, নির্বাচিত দেশাত্মবোধক গানের স্বরলিপি, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রিয় গানের স্বরলিপি, শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানের স্বরলিপি, সুনির্বাচিত দেশাত্মবোধক গানের স্বরলিপি, প্রাথমিক রাগমালা, ছোটদের রাগ অঞ্জলি, হারমোনিয়াম শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ মীরার ভোজন স্বরলিপি, শ্রেষ্ঠ আধুনিক গানের স্বরলিপি, আধুনিক গানের স্বরলিপি, ভারতীয় আধুনিক গানের স্বরলিপি, নির্বাচিত আধুনিক গানের স্বরলিপি, পল্লীগীতির স্বরলিপি, লালনগীতি সমগ্র-১, লালনগীতি সমগ্র-২, শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক গানের স্বরলিপি, ছোটদের গান শেখা, শ্রেষ্ঠ রাগপ্রধান গানের স্বরলিপি, রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি ১ম-৫ম খণ্ড ইত্যাদি।

তিনি একজন গীতিকবি এবং সুরকার হিসেবে ইতোমধ্যে জনমানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পকলা সঙ্গীতে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

আমেনা আক্তার (মিনু আনাহলি)

অভিনেত্রী, পরিচালক ও সংগঠক

এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, ঘর সংসার সামলিয়ে সমানভাবে রাজনৈতিক সামাজিক অঙ্গনে দৃঢ়চিত্তে দৃপ্ত পদচারণা করে– তিনি হলেন সবার পরিচিত, জনপ্রিয় নেত্রী মিনু আনাহলি। তাঁর প্রকৃত নাম আমেনা আক্তার। আমেনা আক্তারের জন্ম ২৫ মে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম মো. আবদুল বাছেদ মিয়া, মাতার নাম খোদেজা খাতুন। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল শহরের দিঘুলিয়ায়।

টাঙ্গাইল শহরের বেপারীপাড়া সরকারি স্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তিনি বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। তারপর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যে বিরতির পর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এলেঙ্গা শামসুল হক ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাগমারী এমএম আলী সরকারি কলেজ থেকে বিএ (পাস) ডিগ্রি লাভ করেন।

মিনু আনোহলীর সমস্ত জীবনটাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভরপুর। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুল-ছাত্রী অবস্থায় টাঙ্গাইলের প্রখ্যাত নারী নেত্রী রাফেয়া আখতার ডলির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে কাজ করেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহান নারীনেত্রী আইভী রহমানের (২১ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ভয়াল গ্রেনেড হামলায় নিহত) উপস্থিতিতে টাঙ্গাইল নাট্যবিতান মিলনায়তনে মহিলা আওয়ামী লীগ প্রথমবারের মত গঠিত হলে মিনু আনোহলি সেই কমিটিতে সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদিকার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী মনোয়ারা বেগমের বাসভবনে অধ্যাপিকা খালেদা খানম ও তাহমিনা খানম মোনাক্কার উপস্থিতিতে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার গুণে নতুন কমিটি গঠিত হলে তিনি যুগ্ম সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে জমকালো পরিবেশে স্থানীয় ভাসানী হল প্রাঙ্গণে মহিলা আওয়ামী লীগের কমিটি পুনরায় গঠিত হয়। জননেতা আব্দুল মান্নান, নারীনেত্রী আইভী রহমান, অধ্যাপিকা খালেদা খানম, শামসুর রহমান খান, ফজলুর রহমান খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গঠিত উল্লিখিত কমিটিতে মিনু আনাহলি সাধারণ সম্পাদকের পদ লাভ করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মিনু আনাহলী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সামাজিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে তিনি

অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেগুলো হলো: (১) যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর, ঢাকা থেকে পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ, (২) জাতীয় মহিলা সংস্থা থেকে এন্টারপ্রেমিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ও লিডারশিপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট, (৩) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ থেকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিএন্ডটি) ও নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্স (৪) উষা থেকে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠন করে তাঁর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সেগুলো হলো–

১। প্রত্যাশা আত্মনির্ভরশীল মহিলা সমিতি, দিঘুলিয়া, টাঙ্গাইল।
২। প্রত্যয় আত্মনির্ভরশীল মহিলা সমিতি, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
৩। মহিলা আত্মনির্ভরশীল সমিতি, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
৪। মহিলা আত্মনির্ভরশীল সমিতি (২) বাজিতপুর বসাকপাড়া, টাঙ্গাইল।
৫। হস্তশিল্প তৈরি প্রশিক্ষণ, দিঘুলিয়া, টাঙ্গাইল।
৬। হস্তশিল্প তৈরি প্রশিক্ষণ, দাসপাড়া, টাঙ্গাইল।
৭। সেলাই প্রশিক্ষণ, দিঘুলিয়া, টাঙ্গাইল।

এগুলোর বাইরেও তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মৃত্তিকা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিদ্যাপীঠ, টাঙ্গাইল; সদস্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, জেলা শাখা, টাঙ্গাইল; প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বাংলাদেশ রবীন্দ্র সম্মিলন জেলা শাখা, টাঙ্গাইল; আজীবন সদস্য, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড: তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাঁর নৃত্যগুরু ছিলেন টাঙ্গাইলের সুবিখ্যাত গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী নিবেদিতা মণ্ডল। তিনি একজন ভাল আবৃত্তিকার ও নাট্যকর্মী। নৃত্যে, আবৃত্তিতে, অভিনয়ে তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'আমরা করবো জয়' টাঙ্গাইলের অন্যতম শিশু সংগঠনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শিশু নাট্যোৎসবে এই সংগঠনটি জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এই সংগঠনটি পিপলস থিয়েটারের ব্যবস্থাপনায় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার উড়িষ্যায় 'জীবনের খোঁজে' নাটক মঞ্চায়িত করে ভূয়সী প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের সনদ লাভ করে।

পারিবারিক জীবন: বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়াকালীন ১৬ জুলাই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল শহরের মীরের বেতকা নিবাসী বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মীর গোলাম সারওয়ার আনাহলির পুত্র তুখোড় ছাত্রনেতা মীর শহীদ আনাহলির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্বশুর-স্বামীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তার মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন। সুখময় সাংসারিক জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের গর্বিতা জননী। ছেলেরা হলেন: শামসুল আরেফিন আনাহলি এমএ (বাংলা), এমকম (ব্যবস্থাপনা), সহকারী ম্যানেজার, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং শফিকুল আনাহলি এমএসএস. (অর্থনীতি), ডিপেণ্ডামা ইন টেক্সটাইল, রাইজিং কোম্পানি, মানিকগঞ্জে কর্মরত। মেয়ে রুমানা আফরীন আনাহলী বিএ ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স। বর্তমানে তিনি স্বামীসহ ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব

মো. দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার হাবলা উত্তরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ হায়দার আলী ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক; মাতা- রাবেয়া খাতুন তারা মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণাকারী। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জামুর্কী নবাব স্যার আব্দুল গণি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস. এস. সি পাস করার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে এসে তিতুমীর কলেজে ভর্তি এবং পরে সা'দত কলেজ হতে এইচ. এস. সি পাস করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের মুহসীন হল শাখার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে দেশসেরা একটি এনজিওতে স্বল্পকাল অতিবাহিত করার পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পদোন্নতির বলে উপ-মহাব্যবস্থাকের দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গর্ব-অহংকার। এমনি একটি গৌরবময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি অসভ্য বর্বর হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সামান্য ভূমিকা রাখতে পেরে তিনি গর্বিত। জনাব রাজিব পারিবারিক পরিবেশেই বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাবার হাত ধরে জামুর্কী স্কুল মাঠে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ চলাকালীন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শুনে এ ধারা আরও শাণিত হয়।

তারপর ক্রমান্বয়ে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়নকালে তৎকালীন টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে বঙ্গবন্ধুর আহবানে ঐতিহাসিক রেসকোর্স সভা সমাবেশের দর্শক-শ্রোতা হয়ে আরো স্বাধিকার সচেতন হয়ে পড়েন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন বুধবার বাসাইলের বাথুলীতে ২ নং কোম্পানি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার সোহরাব আলীর নিকট জনাব দেলোয়ার হোসেন রাজিব তিন বন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধে নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর ঘাটাইলের বহেড়াতৈল ট্রেইনিং ক্যাম্পে দুই সপ্তাহব্যাপী গেরিলা যুদ্ধে পজিশনিং, রাইফেল ও গ্রেনেড পরিচালনা সহ নিজকে সুরক্ষা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সখিপুরের শানবান্ধা ক্যাম্পে অবস্থান করা অবস্থায় সেসময়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীতে (বাসাইল-সখিপুরের নির্বাচিত এমপি) বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত মোমেন শাহজাহান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাবিবুর

রহমান খান তালুকদারের (যুদ্ধাহত অবস্থায়) সান্নিধ্য লাভ সহ। একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১১নং সেক্টরের অধীন টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি ঢাকা টাঙ্গাইল রোডে বীর মুক্তিযোদ্ধা আজহার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান ও অন্যান্য আরো তিন বন্ধুকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটিয়াপাড়া ব্রিজ ভাঙায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এছাড়াও গবরা গ্রামে রাজাকার বেঁধে অস্ত্র সংগ্রহ অপারেশনে যেয়ে বিকেলে ছাওয়ালী বাজারে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কলা বিস্কুট খেতে গেলে মহেরা জমিদার বাড়ি ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকহানাদার বাহিনী বাজার ঘিরে ফেলে এবং তারা চার বন্ধু এক শুভাকাঙক্ষীর ইশারায় মাত্র দুই থেকে তিন মিনিটের ব্যবধানে বাজার থেকে দৌড়ে জীবন রক্ষা পান। ১১ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শত্রুমুক্ত দিবসের সূর্য উঠা ভোরে পাক বাহিনীর সদস্যদের বিতাড়িত করতে গিয়ে সড়কে উল্টো তাদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং আল্লাহর রহমতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পান। সত্যি কথা হলো; এ সব ঘটনাবলী মুক্তিযোদ্ধাদের বলার সুযোগ কোথায়? এভাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের কত ঘটনাই যে অঘটনে পরিণত হতে পারত তার শেষ নেই। বাঙালির গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের পর এ জীবনটাকে বাড়তি জীবন মনে করে সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের নিমিত্তে মানুষের সেবা ও সহযোগিতা করার শপথ নিয়ে সে লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি জামুর্কী হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে সে সময়ের জামুর্কী স্কুল ও সা'দত কলেজের ছাত্রনেতাদের সাথে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) আওয়ামী লীগের প্রায় সকল মহাসমাবেশেই অংশগ্রহণ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ছাত্রলীগের ডাকা মিছিল, মিটিং, শ্লোগানসহ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সামরিক শাসক জিয়া-এরশাদের শাসনামলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মী সংগঠিত করে মিছিল করা ছিলো দুঃসাহসিক কাজ। মিছিল বের হলেই তারা প্রচণ্ড বেগে জিপ গাড়ি মিছিলে উঠিয়ে দিত। সে সময়ের ছাত্রনেতা সর্বজনাব ওবায়দুল কাদের ও বাহালুল মজনুন চুন্নুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে হাজী মুহসীন হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে পর পর ২ বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব রাজিব স্কুল জীবন থেকেই সংগীত পরিবেশনা করলেও স্বাধীনতাত্তোর ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহেদ লিচু পরিচালিত 'নাট্য বিতানে' প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি নজরুল একাডেমি হতে নজরুল সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করে। শিক্ষানবীস অবস্থায় বাংলাদেশ শিল্পকলা আয়োজিত ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সংগীত প্রতিযোগিতায় টাঙ্গাইলে প্রথম স্থান ও পরের বছর নজরুল সংগীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও মুহসীন হলের সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিয়মিত সংগীত পরিবেশনসহ তিনি এবং বর্তমান শিল্পকলার ডিজি লিয়াকত আলী লাকী ও মুকাভিনয় শিল্পী জিল্লুর রহমান জনদের নিয়ে ছাত্রলীগের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লিওগ্রিনের হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং নারায়ণগঞ্জ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে বিপুল

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম স্থান অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলেও সংগীত প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করে আসছেন এবং বর্তমানে বিশেষ শ্রেণির শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করছেন।

বাংলদেশ ব্যাংকে অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভের পর থেকেই ক্লাব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে বিপুল ভোটে ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে ক্লাবে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে আধুনিকায়ন করেন। পরবর্তীতে পরপর ০২ বার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও এরপরে দুই বার সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তার নেতৃত্বে জাতীয় ক্রীড়ায় ভলিবল ও কাবাডিতে প্রিমিয়ার ডিভিশনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করায় বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ করে, খুলনা স্টেডিয়ামে তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক ক্রীড়ায় অসাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও বিনোদন সংবলিত ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিদর্শন করে সে সময়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব নজরুল ইসলাম ও খুলনার দর্শকবৃন্দ আয়োজক ক্লাব হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব ঢাকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জনাব রাজিব সংগঠন প্রিয় মানুষ। তিনি সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪ বন্ধু মিলে বঙ্গবন্ধু পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' গঠন করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই আদর্শিক কর্ম পরিচালনা এবং পরে 'বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন' গঠন করে সভাপতি হিসেবে অবসরের পূর্ব পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক কর্ম সম্পাদন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা তথা সকল বিষয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ ভারত সম্প্রীতি পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব এবং বর্তমানে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের দীর্ঘদিনের কমান্ডার হিসেবে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যৌক্তিক দাবি দাওয়া ও সমন্বিতি গড়ে তোলার মানসে ৪২টি কমান্ডের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে নেতৃত্বদান করেন। এছাড়া ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন ও ড. আতিউর রহমান গভর্নর থাকাকালীন ব্যাংকে শুধু মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের নিয়োগ প্রদানের জন্য সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন করিয়ে নিয়োগের জন্য ২টি সার্কুলারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে যথাক্রমে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জন অফিসার ও ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬৮ জন সহকারী পরিচালক নিয়োগ লাভ করে যা অত্র কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে জনাব রাজিবের বড় অর্জন। এ নিয়োগের জন্য প্রশাসনকে বহুবার অশোভনীয় আচরণ প্রদর্শন করতে হয়। এছাড়াও প্রতি বছরের নিয়মিত নিয়োগের জন্য ৩০% কোটার হিস্যা যথারীতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করেন। তার সার্থকতা এই যে, এতগুলো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান একসাথে ব্যাংকে ব্যাংকে নিয়োগ দিতে পেরেছেন। জনাব রাজিব ব্যাংকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কমান্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কমান্ডের দায়িত্ব নিয়ে কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মুখ্য উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচনে জনাব রাজিব সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বিএনপি-জামাত জোট সকল ক্ষেত্রেই শক্তি প্রদর্শন করতে থাকায়, সে সময়ে ব্যাংকে কেউ নির্বাচন করতে এগিয়ে না এলে; নীল দলের নির্দেশে ক্লাবের সভাপতি হিসেবে জনাব রাজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং পুরো প্যানেলসহ বিজয়ী হন। এ খবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (তখন বিরোধী দলের নেতা) অবগত হবার পর সুধা সদনে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী, জনাব মো. সালাউদ্দিন, জনাব ইসমত কাদির গামাসহ কেন্দ্রীয় অন্যান্য নির্বাচিত নেতার উপস্থিতিতে মাননীয় সভানেত্রী বলেন, 'Congratulation! You are the first person' যে জোট সরকারের সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে খুঁটি গাড়লেন। এভাবে সর্বক্ষেত্রে ওদের হারাতে হবে' বলে ধন্যবাদ দেন।

এরপর বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় কমান্ড দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় কমান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল আহাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে তারা ১৪ জন জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের অনুসরণ করেন, অন্যদিকে বিএনপি জামায়াত জোট প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ান আহম্মেদ ও কবির আহাম্মদ খান-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংসদের তালা ভেঙে সংসদ দখল করে নেয় ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনাব রাজিব সহ অন্যান্যদেরও বহিষ্কার করে। তারা সংসদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তৎকালীন বিরোধী দলীয় প্রধান মাননীয় শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৭নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্থানে আওয়ামী লীগ অফিসের সন্নিকটে অফিস নিয়ে জনাব ইসমত কাদির গামা ও জনাব মো. সালাউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে বিগত ০৭ বছর জোট বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। যা অন্যদের জন্য সহজ হলেও একজন সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে রাজিবের জন্য ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলে ২ বার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অফিসারদের কল্যাণমূলক কাজে আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় সকল পর্যায়ের অফিসারদের প্রশংসা অর্জন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজি বলা ও লেখার উন্নয়নের জন্য তিনি ব্যাংকের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব (ELC) প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে চাকরির শেষাবধি দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ব্যাংকের কর্মচারী কর্মকর্তাদের ব্যাংকিং পেশায় ব্যস্ততার মাঝে মননশীল মানসিকতা সৃষ্টি ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য ব্যাংকে "ঝর্ণাধারা সঙ্গীত শিল্পী সংসদ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং গভর্নর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এর সভাপতি হিসেবে নিয়মিত চর্চা ও বিভিন্ন পর্যায়ের সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া কর্মকর্তাদের অভিনয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে চাকরির শেষাবধি দায়িত্ব পালন করেন।

সুদীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় টাঙ্গাইল জেলা সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে সকলকে জনাব রাজিব মনোরঞ্জন করে যাচ্ছেন এবং টাঙ্গাইল ফাউন্ডেশনের সহ-

সভাপতি হিসেবে টাঙ্গাইলের মানুষের কল্যাণে ঢাকায় কাজ করছেন। এছাড়া নিজের গ্রামের ক্লাব অরুণ সংসদের সাথেও সম্পৃক্ততা রেখেছেন। তিনি জীবনভর বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন, তন্মধ্যে উল্লখ্যযোগ্য- বাংলাদেশ অফিসার্স ক্লাব, বেইলি রোড, ঢাকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উপদেষ্টা- স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ ঢাকা ও আজীবন সদস্য, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ঢাকা ও টাঙ্গাইল ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

নীল দল, বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে শ্রমিকলীগ অন্তর্ভুক্ত সিবিএ নির্বাচন, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ক্যাশ বিভাগের নির্বাচন, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার নির্বাচনসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব নির্বাচনে দীর্ঘদিন ধরেই যথোপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে জয় লাভ করেন। ব্যাংকে নিয়োগ লাভের পর একদিকে অফিসের কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন, অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং সেই সাথে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নিজেকে জড়িয়ে রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে তিনি ব্যাংকিং রেগুলেশন ও নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, সর্বশেষ আধুনিক ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং অর্থাৎ পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগে কাজ করে দেশ ও দেশের উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে চাকরি জীবন শেষ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের মত একটি শীর্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে যেমনি নিজে গর্বিত হয়েছেন তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকল্পে তথা ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নয়নে সারা জীবন সচেষ্ট থেকেছেন।

তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে ইংল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের সভা সেমিনারে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগীত শিল্পী হিসেবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে নেপাল বাংলাদেশ হাই কমিশনারের আমন্ত্রণে রেডিসন হোটেলে বাংলা সংগীত পরিবেশন করে সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন এবং ভারত সরকারের ইস্টার্ন কমান্ডের আমন্ত্রণে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে 'ফোর্ড উইলিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুষ্ঠানে, সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ভারত এবং পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সার্ক পেমেন্ট কাউন্সিল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখেন এবং সম্মেলন শেষে সংগীত পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

তিনি বলেন, একজন চাকরিজীবী হিসেবে জীবনে আর চাওয়া পাওয়ার কিইবা আছে? আর পার্থিব বিষয়াদিতে তার চাহিদাও সীমিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা তথা জাতির শ্রেষ্ঠ সূর্য সন্তান হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়া বঙ্গরত্ন শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রূপকল্পে নিয়োজিত থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের পুনর্বাসনে কাজ করে যাচ্ছেন এজন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা পেলে তাদের ত্যাগ সার্থক হয়েছে বলে মনে করেন।

জনাব রাজিব কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন-২০০১ অংশগ্রহণ করে সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের ভোটে নির্বাচিত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ এর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনের পরের দিন অর্থাৎ ওসমানী মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধার শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর পরিকল্পিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি দলীয় জোট ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক দখল করে নেয়। তিনি তাদের আদর্শিক বিরোধীতা করায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাকে কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে বহিষ্কার করে। তারপর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব নির্বাচনে জনাব রাজিবের নেতৃত্বে সর্বমোট ১৯ টি পদেই জয় লাভ করায় সাহিত্যানুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে জনৈক কর্মকর্তা কর্তৃক বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করার অপরাধে "রাষ্ট্রদ্রোহ" অভিযোগে অভিযুক্ত করে রাজিবকে প্রায় দুই বছর যাবত নিষ্পেষণে রেখে সুকৌশলে চাকরির বাৎসরিক রিপোর্ট নষ্ট করে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রামে বদলী করে দেয়। এ ঘটনা তখন ব্যাংকিং সেক্টরকে আলোড়িত করে। এরপর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে জনাব রাজিব মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ভোটে 'যুগ্ম মহাসচিব' পদে নির্বাচিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে কাজ করে গেছেন।

জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ আয়োজিত ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা অতিথি হয়ে আমন্ত্রিত হয়ে সম্মানিত হয়েছেন। ছাত্র ছাত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের উপর তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ সুমধুর স্মৃতি তার হৃদয়ে আজীবন অম্লান হয়ে থাকবে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক মার্চ মাসে দেশের স্বনামধন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া চ্যানেল নাইনে অনুষ্ঠিত "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ" শিরোনামে অনুষ্ঠানের তিনি পরিকল্পনা আলোচক নির্বাচন ও সঞ্চালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে ১ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যে ৭.৩০ - ৮.৩০ টা পর্যন্ত প্রতিদিন ১ জন করে মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত তিনি ২৬ জন স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ২৬শে মার্চ ২০২২ স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম পি। অনুষ্ঠানটি সারা দেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। অনুষ্ঠানের সকল পর্ব ইউটিউবে "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ" মুক্তিযোদ্ধা ও পরবর্তী প্রজন্মের নিকট চ্যানেল নাইন জিইসি লগইন করলে পাওয়া যাচ্ছে।

জনাব রাজিব ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল মির্জাপুরের ব্যবসায়ীর কন্যা মিসেস জুলী রাজিবের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে দুই কন্যার জনক, প্রিয়াংকা খান রাজিব (তান্নী) ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে মাস্টার্স। বর্তমানে স্থায়িভাবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে বসবাস করছেন ও তিলোত্তমা খান রাজিব (তিশা), বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ পর্বে অধ্যয়ন করছেন।

সাদেক সিদ্দিকী

অতিরিক্ত মহাসচিব
জাতীয় পার্টি (জেপি)
চলচ্চিত্র- নাটক নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনেতা

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টাঙ্গাইল জেলার গুণী ব্যক্তিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, একই সাথে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইলের শিল্পীদের রয়েছে সফল পদচারণা। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইলের যে সকল ব্যক্তির সফল পদচারণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মাঝে সাদেক সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য। তিনি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মীরের বেতকায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শফিউদ্দিন প্রথমে পুলিশে চাকরি করলেও পরবর্তীকালে ব্যবসা করতেন। মাতা শিরিন আক্তার ছিলেন সুগৃহিণী। পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মাঝে তিনি প্রথম। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মীরের বেতকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাস করেন। সরকারি সা'দত কলেজ হতে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় হতে সমাজকল্যাণে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

শৈশব থেকেই তিনি সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলেন। যদিও পরিবারের কেউ এ বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না; তথাপিও তিনি নিজ প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পথ চলা শুরু করেন। পরিবারের অবজ্ঞার স্বীকারও হতে হয়েছে বহুবার; কিন্তু মনের মাঝে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে শুরু করেন। টাঙ্গাইলের প্রাচীন নাট্যকার ও নির্দেশক সুবিনয় দাশ ছিলেন তার ওস্তাদ। তিনি স্বরগম নাট্যগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মঞ্চ নাটকে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি অভিনয় শুরু করেন। সেই সময় মঞ্চে নারী অভিনেত্রীর অভাব থাকায় এবং তিনি দেখতে সুন্দর হওয়ায় নারী চরিত্রেও অভিনয় করেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে প্রথম তিনি নায়কের চরিত্রে মঞ্চে অভিনয় করেন। সেই সময় দুলাল আনাহলি, ফারুক কোরেশী, নাট্যকার মাঈন উদ্দিনসহ অনেকেই তার সাথে অভিনয় করতেন এবং তাদের নিকট থেকে তিনি ভাল অভিনয়ের জন্য অনুপ্রেরণা পেতেন।

প্রথমে পারিবারিক বাধা আসলেও পরবর্তীকালে মঞ্চে তার অভিনয় দেখে দাদা খুশি হন এবং প্রশংসা করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি ঢাকায় চলে যান। সেখানে বন্ধু

ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এলেন মল্লিকের সহায়তায় তিনি অপরূপ নাট্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে চাষী নজরুল ইসলাম, মসিউদ্দীন শাকের ও আজিজুর রহমানের সাথে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি চাষী নজরুলের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রেডিওতে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দেই টিভি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিটিভির তালিকাভূক্ত শিল্পী হন। তবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি। তিনি এ পর্যন্ত ৪১টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং একটিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে তিনি খলনায়ক হিসেবেই বেশি অভিনয় করেন। তার অভিনীত চলচ্চিত্রের মাঝে আঘাত পাল্টা আঘাত, অশান্ত মন, সাগরিকা, আশা আমার আশা, বাদশাহ ভাই উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নিয়ে সাগরিকা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ পর্যন্ত তিনি ছয়টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তার সর্বশেষ চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে 'হৃদয়ে একাত্তর'। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছে ইমন, রোমানা, সহিদুল ইসলাম সাচ্চুসহ অনেকে। এ পর্যন্ত তার নির্মিত খণ্ডনাটক ১৫৩টি, টেলিফিল্ম ৪৮টি ও ধারাবাহিক নাটক ৪টি। তার নির্মিত আরটিভিতে প্রচারিত রঙের সংসার এবং এটিএন বাংলায় প্রচারিত তিনভূবন ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে তিনি নির্মাণ করেন দুই বিঘা জমি, দেনা পাওনা ও ত্যাগ। তার লেখা নাটক 'আলোর পথে' বাংলাদেশ বেতারের প্রথম প্রচারিত নাটক।

এ পর্যন্ত তিনি ৩৬টি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বর্তমানে চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দা সামসুন্নাহারের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসারের শোভাবর্ধন করেছে একমাত্র সন্তান সাগর সিদ্দিকী। তিনি পেশায় আইনজীবী হলেও শৌখিন অভিনেতা। পুত্রবধূ 'আন্না' একসময় চলচ্চিত্রে অভিনয় করতেন।

নবকুমার দে

চারণ কবি, সুরকার ও গীতিকার

নবকুমার দে নয়া ৫ মে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দেলদুয়ার উপজেলার হিঙ্গানগর গ্রামে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বয়াতী গোবিন্দ চন্দ্র দে- মাতা ষোড়শী রাণী দে সুগৃহিণী। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে নবকুমার জ্যেষ্ঠপুত্র।

শৈশবে হিঙ্গানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণি পাস করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তারক যোগেন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন।

কর্মজীবন: ছাত্র অবস্থায় লেখাপড়া ও সংসারের হাল ধরেন ছোট ভাইবোনদের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে তার ভূমিকা রয়েছে। নবকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রা অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন ও পুরস্কার পান। হাইস্কুলে বিভিন্ন গানের ও গজলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ১০ বছর বয়স থেকেই গানের জগতে আসেন। নানা প্রতিকূলতার কারণে লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর নয়াকৃষি আন্দোলনে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে গান গাওয়া ও ধান গবেষণার উপর গান গাওয়ার জন্য উবিনীগ জন্য থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া পাঠানো হয়। তিনি ১১ দেশের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে 'উবিনীগ' নয়া কৃষি আন্দোলন, টাঙ্গাইলের কৃষক প্রতিনিধি হিসাবে দুবাই, তিউনিসিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় পাঠায়। সেখানে ১২৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে নব কুমার ১২টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে ৫টি প্রতিষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন। যেমন নয়া কৃষি আন্দোলন, জেলা তথ্য অফিস টাঙ্গাইল, ছায়ানীড়, টাঙ্গাইল। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কৃষিমেলা, বৃক্ষমেলাসহ বহু অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে প্রশংসিত হন। নবকুমার পিতার মত গান রচনা করতে পারেন। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায় তথ্য অফিসের মাধ্যমে শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, মাদক, পরিবেশ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে গান পরিবেশন করে যাচ্ছেন।

সুখময় সংসার জীবনে তিনি ২ মেয়ের আদর্শ জনক। দুই মেয়ে বিবাহিতা। বিভিন্ন তথ্যমূলক গান পরিবেশন করার জন্যই তিনি দেশে ও বিদেশে প্রশংসা অর্জন করেছেন। গান গাওয়ার সুবাদেই বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

আজিজুল ইসলাম খান স্বাধীন

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আজিজুল ইসলাম খান স্বাধীন অন্যতম। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের থানাপাড়ায় পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল জলিল খান ছিলেন টাঙ্গাইলের একজন সম্মানিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। মাতা সাহারা বানু।

ছোটবেলা হতেই খেলাধুলা এবং সংস্কৃতির প্রতি ছিল খুব ঝোঁক। কিন্ডারগার্টেন স্কুল (বর্তমান মডেল প্রাইমারি, টাঙ্গাইল), টাউন প্রাইমারি, বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল জীবন সমাপ্ত করেন। এইচএসসি এবং স্নাতক করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে সমাপ্ত করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। নাটকে অভিনয়ের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় ভালবাসা। থানাপাড়ায় নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশনায় আব্দুর রহমান রক্কু ও ফারুক কোরেশী পরিচালিত রওশন টোকিজের নাট্যমঞ্চে সম্রাট নাটকে 'ব্রাহ্মণ' চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তার অভিনয় যাত্রা শুরু হয়। এরপর অধ্যাপক সাযযাদ কাদিরের নাট্য গোষ্ঠীতে যোগ দেন। সাযযাদ কাদির পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে অভিনয় করেন। তাদের শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে চম্পক নাট্যগোষ্ঠী টাঙ্গাইল জেলা পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল মফস্বল নাট্যগোষ্ঠী তার মত আরো কিছু তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যব্যক্তিত্ব গোলাম আম্বিয়া নূরী রচিত 'আধপোড়া সানকি' নাটকে অভিনয় করেন। মফস্বল নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় এসএম সোলায়মানের ইলেকশন ক্যারিকেচার ও ইঙ্গিত নাটকে অভিনয় এবং নাটক মঞ্চায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

এছাড়াও শফিকুল ইসলাম মনি এবং অধ্যাপক কাদের শাহ পরিচালিত বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি টাঙ্গাইল রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, টাঙ্গাইল ক্লাব, এফপিএবি, টাঙ্গাইল রাইফেল ক্লাবের আজীবন সদস্য এবং বর্তমানে টাঙ্গাইল রাইফেল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক।

সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ভারত বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণ করেছেন।

ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

বৈবাহিক জীবনে তিনি তিন সন্তানের জনক। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি বিভিন্ন নাট্য মঞ্চায়নে সহায়তা করে আসছেন।

খালেদ খান

২০২২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত

টাঙ্গাইলের যে কয়জন শক্তিমান অভিনেতা বিভিন্ন মিডিয়ায় অভিনয় করছেন তাদের মধ্যে খালেদ খান অন্যতম। পুরো নাম খালেদ মাহমুদ খান যুবরাজ। তিনি একজন শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন। তার জন্ম ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মির্জাপুর উপজেলার মসদই গ্রামে। বাবা নজরুল ইসলাম খান (কালু খাঁ) ছিলেন স্কুল শিক্ষক। কিন্তু তিনি ফুটবল খেলা, অভিনয় ও গানে ভীষণ পারঙ্গম ও এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন।

মাতা খালেদা বেগম তারও গান গাইবার অপূর্ব দক্ষতা ছিলো। নয় ভাইবোনের মধ্যে খালেদ খান সবার বড়। খালেদ খানের হাত ধরে তার ভাই শাহীন খান অভিনয়ে এলেও পরে আর পেশাগত কারণে ধরে রাখতে পারেননি। খালেদ খানের ছোট ভাই মামুন জাহিদ বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী। টেলিভিশন ও মঞ্চে অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মামুন জাহিদ।

এভাবেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে সাংস্কৃতিক চর্চায় তার বেড়ে ওঠা। নাটকে হাতেখড়ি বাবার হাত ধরে স্কুল জীবনেই। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে বিকম এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এমকম ডিগ্রি লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়া এই শিল্পী অভিনয় শুরু করেন আশির দশকে, মঞ্চনাটকের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে নিয়মিত নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সাথে মঞ্চ নাটকে জড়িত ছিলেন। মঞ্চে তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে দেওয়ান গাজীর কিসসা, অচলায়তন, নূরুল দীনের সারা জীবন, ঈর্ষা, দর্পণ, গ্যালিলিও ও রক্তকরবী। ঈর্ষা নাটকে অভিনয়ের জন্য কলকাতায়ও তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মঞ্চে তিনি ৩০টির বেশি নাটকে অভিনয় করেন।

খালেদ খান নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার পুতুল খেলা, কালসন্ধ্যা, স্বপ্নবাজ, রূপবতী, মাস্টার বিল্ডার, ক্ষুদিত পাষাণসহ ১০টি।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে টিভি নাটকে অভিষেক হয় তার। খালেদ খান অভিনীত প্রথম টিভি নাটক হলো সিঁড়িঘর। হুমায়ুন আহমেদের ধারাবাহিক নাটক 'এইসব দিনরাত্রি' ও ইমদাদুল হক মিলনের 'রূপনগর' নাটকে

অভিনয় করে সে সময় দারুণ জনপ্রিয়তা পান তিনি। 'রূপনগর' নাটকে 'ছি, ছি, তুমি এতো খারাপ' সংলাপটি সেই সময় দর্শকের মুখে মুখে ফিরত। এরপর অসংখ্য টিভি নাটকে অভিনয় করেন তিনি। তার অভিনীত জনপ্রিয় টিভি নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– এইসব দিনরাত্রি, তুমি কোন কাননের ফুল, মফস্বল সংবাদ, লোহার চুড়ি, সকাল সন্ধ্যা, ফেরা, মোহর আলী, কেবলই রাত হয়ে যায়, দক্ষিণের ঘর, দমন, মুহূর্ত, শীতের পাখি ইত্যাদি।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বেক্সিমকো ফার্মার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি একুশে টেলিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউএলবি) তে রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি মোহাম্মদ জাকারিয়া পদক, নুরুন্নাহার স্মৃতি পদক, সিজেএফবি সেবা পরিচালক, ইমপ্রেস অন্যদিন সেরা অভিনেতাসহ বেশ কয়েকটি সম্মাননা লাভ করেন।

খালেদ খান বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সহধর্মিণী মিতা হক ২০২০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক লাভ করেন। সংসারে একমাত্র কন্যা– কণ্ঠশিল্পী ফারহিন খান জয়িতা।

তিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর বারডেম হাসপাতালে মটর টিউরন রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্পকলার অভিনয় শাখায় তার অবদানের জন্য ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তাকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক (মরণোত্তর) একুশে পদক প্রদান করা হয়।

প্রফেসর ডা. রতন চন্দ্র সাহা

বহুমাত্রিক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ডাক্তার রতন চন্দ্র সাহা। চিকিৎসক, কবি, সংগঠক নাট্যমোদী ও পর্যটক তিনি। টাঙ্গাইলের স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রফেসর ডা. রতন চন্দ্র সাহা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার থিসিসের বিষয় ছিল ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। এর আগে তিনি চিকিৎসাসহ মানবতার সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক পদক, পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

টাঙ্গাইল জেলাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার বহুমাত্রিক প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবে ডা. রতন চন্দ্র সাহা যেমন সুপরিচিত তেমনি সমাদৃত। শিক্ষাজীবনে ছিলেন বরাবরই মেধাবী, কর্মজীবনে মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক। তার বাইরে সমাজসেবামূলক বহুমুখী কার্যক্রমের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি মানবতাবাদী সংগঠক হিসেবে সফল রোটারিয়ান। শান্তি ও কল্যাণমুখী ধর্মীয় শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে রয়েছে তার সক্রিয় ভূমিকা ও সহযোগিতা। তিনি যেমন দক্ষ চিকিৎসক তেমনি মননশীল লেখক। তিনি নিজে যেমন আলোকিত মানুষ তেমনই সুশিক্ষা ও সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তুলতে চান আলোকিত মানুষ, আলোকিত দেশ ও সমাজ। নাট্যকর্মী ও অভিনেতা হিসেবেও তিনি সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদৃত। মানবতাবাদী হিসেবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই তার কাছে সমমূল্যের অধিকারী। তবে অন্যায় অসততা ও অনাচারের ক্ষেত্রে তিনি আপোষহীন ও স্পষ্টবাদী।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ডা. রতন চন্দ্র সাহা মানবসেবা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কল্যাণমুখী অবদানে সমাজের কাছে অনুসরণযোগ্য আদর্শ মানুষ। এ কারণে তিনি দেশে বিদেশে যেমন পরিচিতি অর্জন করেছেন সমাদৃত হয়েছেন তেমনই লাভ করেছেন অনেক পুরস্কার, স্বীকৃতি ও সম্মাননা।

শৈশব থেকেই এমন একটি সুমহান মন নিয়ে বেড়ে ওঠেছেন রোটারিয়ান ডা. রতন চন্দ্র সাহা। তার জন্ম ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার কাবিলাপাড়ায়। পিতা দীনেশ চন্দ্র সাহা, মাতা বাণী রাণী সাহা। নিজ এলাকার বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর মেধাবী ছাত্র রতন চন্দ্র সাহা সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান শাখায় স্টারমার্কসসহ ৬টি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি এমএম আলী

কলেজ হতে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন থেকে স্নাতকোত্তর ডিটিসিডি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দি ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট এন্ড এডুকেশনাল অ্যাক্রিডিটেশন ফাউন্ডেশন হতে আইসিইএএফ অর্জন করেন। তিনি পালমোনোলজি কোর্স এবং আল্ট্রাসনোগ্রাম কোর্সসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি দেশ ও বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগদান করেন। লন্ডনস্থ রয়েল কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স (ইউকে) পরিচালিত ডিএফএম কোর্স কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন। আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিশিয়ান থেকে এফসিসিপি লাভ করেন। তিনি এজমা এসোসিয়েশন কর্তৃক এজমা রোগের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

এরপর তিনি চেন্নাই (মাদ্রাজ) এ্যাপোলো হসপিটালস্-এ প্রখ্যাত ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. এস.আই, সত্য মূর্তির অধীনে কার্ডিওলজি, ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং ইনটেন্সিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ)-এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থ এ্যাপোলো হসপিটালস থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সার্টিফিকেট কোর্স ইন কার্ডিয়াক ইমারজেন্সি সমাপ্ত করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে সার্জিক্যাল নট টাইং ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক আয়োজিত ডাটা ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এ্যাজমা ওরিয়েন্টেশন, টিবি এন্ড লেপ্রসি কন্ট্রোল সার্ভিসসহ অনেক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স অন আল্ট্রাসাউন্ড হোস্টেট বাই জেফারসন আল্ট্রাসাউন্ড এন্ড রেসার্স এডুকেশন ইনস্টিটিউট, ফিলাডিলফিয়া, ইউএসএ এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর আল্ট্রাসাউন্ড ইন মেডিসিন এন্ড বায়োলজি অংশগ্রহণ করেন এবং সিএমই ক্রেডিট লাভ করেন।

তিনি রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এফসিসিএস ফেলোশিপ গ্রহণ করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা- (ইন্দোনেশিয়া) হতে ফেলোশিপ লাভ করেন। আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন থেকে এসিএলএস প্রভাইডারশিপ লাভ করেন। দিল্লি বল্লভ ভাই প্যাটেল চেস্ট ইনস্টিটিউট থেকে এ্যাজমা ও ইমুনোলজি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিশিয়ানের সদস্য ও অ্যামেরিকান এ্যাজমা, ইমুনোলজি এসোসিয়েশন-এর সদস্য, ব্রংকোকন, ভারত আজীবন সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল সোসাইটি অব রেসপাইরোলজি আয়োজিত প্রশিক্ষণে জাপান ও অস্ট্রেলিয়া গমন করেন।

তিনি জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত এ্যাজমা বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দুবাইতে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অব ইমুনোলজি কর্তৃক আয়োজিত এ্যাজমা ও ইমুনোলজি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ ও ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী হিসেবে সরকার কর্তৃক পদক ও সনদ প্রাপ্ত হন।

২০১২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার অ্যারিজোনাতে অনুষ্ঠিত American college of chest physician কর্তৃক আয়োজিত Palmonary Board Review Course সমাপ্ত করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার লস এঞ্জেলসে আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত কনভোকেশনে পিএইচডি সনদ গ্রহণ করেন।

তিনি ইনভায়রনমেন্টাল বিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্য রোটারি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড পান এবং এ সমিতির রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্সিয়াল সাইটেশন লাভ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ডোনার হিসেবে তাকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে পিএইচএফ (পলহেলারস্ ফেলোশিপ) খেতাব প্রদান করেন। তিনি জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার (চিকিৎসাসেবায়)-২০১০ লাভ করেন এবং জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার (পল্লী উন্নয়নে)-২০১২ লাভ করেন। সাহিত্যমোদী ডা. রতন চন্দ্র সাহা কবি-সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে 'দীনেশ বাণী সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। ডিজিটাল ফ্যামিলি হিসেবে তার পরিবার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হন।

তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল মিশন (কার্ডিওভাসকুলার) কর্তৃক আয়োজিত ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফি এন্ড এ্যারাদমিয়া শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের লাহোরে পার্লকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আলট্রাসাউন্ড সেমিনার ও কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বারউন ইনস্টিটিউট অব কানাডা এবং বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ ইন মেডিসিন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ইন আলট্রাসাউন্ড-এ অংশগ্রহণ করেন। বারউন ইনস্টিটিউট অব কানাডা থেকে ডি. আল্ট্রা ও আল্ট্রা সাউন্ডের উপর এসডিএমএস লাভ করেন।

ডা. সাহা ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রেসপিরিটরি মেডিসিন বিভাগে যোগদান করেন এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে বিভাগীয় প্রধান (রেসপিরিটরি মেডিসিন) হিসেবে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। পরে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে উক্ত কলেজে যোগদান করেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।
ডা. সাহা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার গবেষণালব্ধ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সিওপিডি-এর উপর তার রয়েছে এক বৃহৎ থিসিস। এছাড়াও তিনি দিল্লিস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালে তার গবেষণা ডায়রিয়াল ডিজিস-এর উপর এক থিসিস প্রকাশ করেন।

কর্মজীবনে তিনি একজন সফল চিকিৎসক। তিনি শুধু একজন ব্যস্ততম সফল চিকিৎসক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীই নন, একজন সমাজসেবক ও অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ডা. সাহার সামাজিক সম্পৃক্ততা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান: ডা. সাহা অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি বৃত্তির প্রচলন করেছেন। হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বৃত্তির ব্যবস্থা। তার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবী হিসেবে

সনদ ও পদক পেয়েছেন। দীনেশ বাণী গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ডশিপ-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর যেখান থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডা. রতন-কুমকুম বৃত্তি নামে হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

পোড়াবাড়িতে পাঠাগার স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলে বিশ জোড়া বেঞ্চ প্রদান, দুটি স্টিলের আলমারি প্রদান, ব্র্যাকের সাথে যৌথ খরচে শ্রেণি কক্ষ মেরামত, স্কুলের রাস্তা মেরামতে সহায়তা। ক্যাব গঠনে সহায়তা, ক্যাব সদস্যদের প্রত্যেককে পোশাক সরবরাহ করা। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই খাতাপত্র প্রদান। বিভিন্ন স্কুলে দশটি ফ্যান প্রদান। স্কুলের বাগান তৈরিকরণ, বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা এবং সংরক্ষণ। স্কুলে এ্যাসেম্বলি ক্লাস পরিচালনার সুবিধার্থে মাইক্রোফোন (হ্যান্ড মাইক প্রদান), বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে (সাক্ষরতা অভিযান) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যক্রম প্রচারের জন্য ৪২৫টি সাইন বোর্ড স্থাপন করেন যা 'উজ্জীবিত টাঙ্গাইল' কার্যক্রমকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়।

বর্তমানে তিনি পোড়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির আজীবন সদস্য।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবদান: দুঃস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসার দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত। শিশু ও মায়েদের চিকিৎসার নিমিত্তে তিনি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন নিজ এলাকা রক্ষিত বেলতায়। কাবিলাপাড়ায় তিনি Free Friday Clinic নামে তার নিজ এলাকায় প্রতি শুক্রবার বিনামূল্যে রোগী দেখার ব্যবস্থা করে আসছেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

প্রতিদিন গড়ে প্রাইভেট চেম্বারে ১০-১২ জন রোগীদের বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন ও ক্ষেত্র বিশেষ বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করেন।

প্রলয়ংকরী '৮৮ এর বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন যমুনা, ধলেশ্বরী বিধৌত চর এলাকায় যা আজও মানুষের মুখে মুখে। '৯৮-র বন্যায় দুর্গত মানুষের সেবায় চর থেকে চরে মেডিকেল টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ধলেশ্বরীতে নৌকা ডুবিতে পড়ে একবার বিপদগ্রস্থও হয়েছিলেন সে সময়ে। কিন্তু তবুও পিছপা হননি মোটেই। উক্ত সময়ে চরপৌলি এবং কাতুলি ইউনিয়নে অতিমারী আকারে ডায়রিয়া দেখা দিলে তিনি সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে দুর্গত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

'মিসেলস ক্যাম্পেইন' এ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত প্রথম থেকে শুরু করে ১৬তম জাতীয় টিকা দিবসে প্রশংসিত ভূমিকা পালন করেছেন যা অত্র এলাকার পোলিও নির্মূলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। মেসেলস ক্যাম্পেইনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবজাতক, শিশু, মহিলাদের নিবিড় টীকা দান কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনগণের মাঝে এ কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা রাখেন। তিনি ইপিআই কর্মসূচির জেলা প্রশিক্ষকের ভূমিকাও পালন করেন। আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণের এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৭ এর প্রলয়ংকরী বন্যায় দুর্গত মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে জেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে গমন করেন। এছাড়া নিরন্ন মানুষের মাঝে রিলিফ সামগ্রীও পৌঁছে দেন। যৌথ বাহিনীর সাথে ও রোটারি ক্লাবের সাথে জেলার প্রত্যন্ত দুর্গত এলাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

১৯৯৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মা এবং শিশু স্বাস্থ্য, ইপিআই, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করে তুলেন। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করেন। চিকিৎসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করে জনগণের মধ্যে রোগ শনাক্ত ও পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা চালানোর ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেছেন। যক্ষ্মা বিষয়ে নারী নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যক্ষ্মা আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। এ বিষয়ে গণজাগরণের সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। মাল্টিড্রাগ রেসিসস্ট্যান্ট যক্ষ্মা রোধে জনগণকে সচেতন করেছেন। যানবাহন মালিকদের নিয়ে এ বিষয়ে সচেতন করেছেন সেমিনারের মাধ্যমে। 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালি ও সেমিনারে বক্তব্য দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এইডস/এইচ.আইভি প্রতিরোধে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যৌন কর্মীদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন কর্মশালা করেছেন। জাতীয় এইডস দিবসে আয়োজিত র‌্যালি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। সরকার এবং এনজিও কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন।

সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার শিউলে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অব রেসপাইরোলজি (APSR) কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা: রক্তদান কর্মসূচি আহ্বান করে প্রায় ১১০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে হাসপাতালে মুমূর্ষু দুস্থ রোগীদের জন্য প্রদান করেন।

এতিমখানায় বিনামূল্যে চিকিৎসা: মধুপুর এতিমখানায় বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা প্রদান করেছেন।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর।

সাহিত্য ও প্রকাশনা শিল্পে সম্পৃক্ততা: তিনি একজন কবি, সুসাহিত্যিক। তার প্রকাশিত চারটি কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাচিত কবিতা', 'রক্তবীজ', 'শরতের শিউলি' পাঠক সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে তার প্রবন্ধ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। শিক্ষা বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি লেখা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। তার দুই থিসিস প্রকাশিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সম্পৃক্ততা: তিনি একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা, সুবক্তা। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাসহ প্রায় ৪০টি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন অনেক। ৫ম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় তার প্রথম নাটক 'পলাশীর রাক্ষুসী'তে তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

অনেক সেবামূলক সামাজিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী সিডিসি ক্লাবের আজীবন সদস্য, নাট্যবিতানের আজীবন সদস্য, সাধারণ গ্রন্থাগার ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির আজীবন সদস্য। প্রেস ক্লাবের একজন সহযোগী সদস্য। রেড ক্রিসেন্টের আজীবন সদস্য এবং পরিবারের প্রত্যেকেই। তিনি প্রকাশনা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানীড়-এর আজীবন সদস্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মাইনকার চরে গমন করেন। সেখানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি।

খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতা: খেলাধুলায় তিনি বিশেষ উৎসাহী। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবল, ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। চরাঞ্চলে ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা বাইচের আয়োজন করেছেন। চৌদ্দ কানার হাডুডু খেলার তিনি একজন উদ্যোক্তা। প্রায় প্রতি বছরই ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। দুর্গা পূজায় আরতি প্রতিযোগিতাসহ আরও গান বাজনা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন।

রোটারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: তিনি একজন রোটারিয়ান। রোটারি ক্লাব অব টাঙ্গাইল সেন্ট্রালের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দুর্গত এলাকায় দুস্থ মানুষের সেবা করেছেন প্রচুর। শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যসেবায় তাঁর কাজের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। ওদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ডেন্টাল কেয়ার প্রকল্প চালু করেছেন। এছাড়াও তিনি শিশুদের মাঝে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ করেছেন। তার সময়ে এবং পরবর্তীতে কয়েকটি চক্ষু শিবিরের আয়োজন করেছেন। যেখানে প্রায় দুই হাজারেরও বেশী রোগী চিকিৎসা ও চশমা পেয়েছেন এবং প্রায় ৫০ জন রোগীকে কনটাক্ট লেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এ লক্ষ্যে সাদা ছড়ি দিবসে ২৫ জন অন্ধকে সাদাছড়ি বিতরণ করেছেন। শীতার্তদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও রোপন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। রোটার‌্যাক্ট ক্লাব অব মাওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল তার হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত (০৪.০৬.২০)। উক্ত ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সেবামূলক ডেন্টাল, ও সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন এবং দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বই-খাতা বিতরণ করেছেন। Environment Improvment বিষয়ে সারাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয় পর্যায়ে। উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সনদও তিনি পেয়েছেন। Rotary International কর্তৃক

Rotary Presidential Citation পেয়েছেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় Rotary Club এর উদ্যোগে প্রত্যন্ত চর এলাকায় বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করেছেন। International Donar হিসেবে Rotary International কর্তৃক RFSM খেতাব পেয়েছেন। পরবর্তীতে রোটারি ফাউন্ডেশনে আরো দান করার স্বীকৃতি হিসেবে পি.এইচ.এফ খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন রোটারি ক্লাব অব টাঙ্গাইল সেন্ট্রালের প্রেসিডেন্ট (২০০৫-২০০৬) ছিলেন।

ধর্মীয় অঙ্গনে সম্পৃক্ততা: কট্টর কোনো ভাবাদর্শে নয় বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ডা. সাহা বিভিন্ন মন্দির, মসজিদের উন্নয়নে সহায়তার হাত বাড়ান।

স্কাউট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: স্কাউট আন্দোলনে আগ্রহী ডা. সাহা তিন তিন বারের মোট নয় বৎসর জেলা স্কাউটের সহকারী কমিশনার (স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন) নিযুক্ত ছিলেন।

রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমে অবদান: রেডক্রিসেন্টের আজীবন সদস্য হিসেবে সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ত্রাণ শিবিরে চিকিৎসা প্রদান, জাতীয় টীকা দিবসসমূহে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিবিড় অংশগ্রহণ করে সংস্থাকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন।

নিসচা তে অংশগ্রহণ: 'নিরাপদ সড়ক চাই'এর উপদেষ্টা হিসেবে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনার উপর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ও সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়া সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট ছাপিয়ে বিতরণ করেছেন।

সংবর্ধনা: ১.পোড়াবাড়ি নাট্যকর্মী দল থেকে-২০০২, (২) সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে-২০০২, (৩) রক্ষিত বেলতা মাদ্রাসা থেকে-২০০২, (৪) রাধা গোবিন্দের আশ্রম, কাবিলাপাড়া থেকে-২০০২, (৫) পোড়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০০২, (৬) নাট্যবিতান টাঙ্গাইল-২০০২, (৭) আলোকিত মানুষের সম্মাননা প্রদান-ছায়ানীড় (নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি) ঢাকা-২০০৪, (৮) শ্রী শ্রী কালিবাড়ি, টাঙ্গাইল-২০০৬, (৯) সদর উপজেলা পরিষদ টাঙ্গাইল-২০০৬, (১০) সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ-২০০৬, (১১) গুণীজন সংবর্ধনা ছায়ানীড় কর্তৃক (আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-২০০৭।

পদক/পুরস্কার : (১) পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠকালীন বাঘিল সমিতির অধীনে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার এবং স্বর্ণপদক অর্জন। (২) নবাব সিরাজউদ্দৌলা অভিনয়ে ৩টি রৌপ্য পদক ও একটি স্বর্ণপদক, (৩) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ স্বর্ণপদক। (৪)উজ্জীবিত টাঙ্গাইল-২০০১ এবং সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন-২০০১ জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদ লাভ। (৫) ঢাকা বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী- ২০০১ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় বিভাগীয় কমিশনার প্রদত্ত স্বর্ণপদক ও সনদ প্রাপ্তি। (৬) চিকিৎসাসেবায় অনন্য অবদানের জন্য ছায়ানীড় পদক ও সনদ-২০০৩। (৭) প্রশংসা পত্র ও ক্রেস্ট-২০০৬ ত্রিবেনী, টাঙ্গাইল। (৮) সমাজ গবেষণা কেন্দ্র টাঙ্গাইল কর্তৃক সম্মাননার জন্য নির্বাচিত। (৯) প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট

সম্মাননা-২০০৬। (১০) পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ রোটারি ক্লাব অব টাঙ্গাইল-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ঢাকায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে রোটারি গভর্নরের হাত থেকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রাপ্তি-২০০৬। (১১) রোটারি ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট কার্ল ওয়ার্লহেম কর্তৃক 'Presidential citation' লাভ-২০০৬| (১২) বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী নির্বাচিত (দ্বিতীয় বার) ২০০৬। (১৩) গুণীজন সম্মাননা পুরস্কার (ছায়ানীড়) ২০০৯, স্থান: শওকত ওসমান মিলনায়তন, শাহবাগ, ঢাকা। (১৪) মাওলানা ভাসানী স্বর্ণপদক-২০১০ (সমাজসেবায়)। (১৫) জাতীয় সাহিত্য সম্মাননা পুরস্কার-২০১০ রিপোর্টার্স মিলনায়তন, ঢাকা। (১৬) অভিষেক অনুষ্ঠান গুণীজন সম্মাননা-২০১১ (আয়োজনে: প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি টাঙ্গাইল)। (১৭) Crest of Honour (Platinum Rotary year 2012-13 (১৮) গুণীজন সম্মাননা-২০১৪ (চিকিৎসাসেবায়) আয়োজনে: রোজ গার্ডেন শিক্ষা পরিবার। (১৯) গুণীজন সংবর্ধনা-২০১৪, চিকিৎসাসেবায়, শ্রী ফলিয়াটা মানব কল্যাণ যুব সংঘ। (২০) বঙ্গবন্ধু বাঙালি ও বাংলাদেশ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশনা এবং গুণীজন সংবর্ধনা-২০১৭। আয়োজনে: ছায়ানীড়। স্থান: আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। (২১) শের-ই বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পদক বাংলাদেশ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক সোসাইটি-২০১৬। স্থান: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা। (২২) সাহিত্য সাগর পুরস্কার-২০১৬ (বিশ্ব সাহিত্য উৎসব, জীবন বাজার পত্রিকা, স্থান: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বারভাঙ্গা হল। (২৩) মানবাধিকার শান্তি পদক-২০১৭ (সফল চিকিৎসক ও মানবসেবক, আয়োজনে: মুভমেন্ট হিউম্যান রাইটস (জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা বাস্তবায়নকারী), ঢাকা। (২৪) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মৃতি গোল্ড মেডেল-২০১৭, আয়োজনে: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা। (২৫) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার-২০১৬ মাদার পাবলিশিং এন্ড মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চারুকলা পর্ষদ অবনীন্দ্র সভা, কলিকাতা। (২৬) আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন গুণীজন সম্মাননা, শিক্ষা সংস্কৃতি রত্নপুরস্কার-২০১৬; কলিকাতা। (২৭) দেবী পক্ষ কবি প্রণাম ও গুণীজন সম্মাননা শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাদেবী পুরস্কার-২০১৭। আয়োজনে মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ। (২৮) মাদার তেরেসা স্মারক সম্মাননা-২০১৭; (মাদার তেরেসা আদর্শ ও দর্শন চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা)। (২৯) জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম স্মৃতিপদক-২০১৭। সফল চিকিৎসক ও মানবসেবক হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য । (৩০) মাদার তেরেসা আদর্শ ও দর্শন চর্চা কেন্দ্র

সম্মাননা স্মারক-২০১৭। (৩১) Nepal Bangladesh Friendship ceremony International Award-2019. letter of appreciation for the best contribution as Doctor & Social activities. (৩৪) মাদার তেরেসা নোভেল পিস অ্যাওয়ার্ড; ২০২০ চিকিৎসা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য। আয়োজনে: ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর হিউম্যান রাইটস (জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ঘোষণা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ) (৩২) বাংলাদেশ ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত করোনার বিপর্যয়ে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে অসহায়, ভাসমান দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় অধ্যাপক ডা. রতন চন্দ্র সাহাকে শুভেচ্ছা ও

ধন্যবাদসহ সনদ প্রদান। (৩৩) দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসীন সম্মাননা-২০১৭ মানব কল্যাণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ। আয়োজনে: দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসীন স্মৃতি সংসদ, উত্তরা, ঢাকা। (৩৪) Certificate of Covid-19 fighter International Honor-2020Nepal-Bangladesh Friendship Association Kathmondu, Nepal.

(৩৫) ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অনন্য অবদানের জন্য ভারতের বোম্বে অনুষ্ঠিত দাদা সাহেব ফালকি আইকন এওয়ার্ড ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল-২০২২ সম্মাননা লাভ করেন।

পারিবারিক অধ্যায়: ডা. রতন চন্দ্র সাহা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শেরপুরের কুমকুম সাহার সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ২ পুত্র ও ১ কন্যার জনক তিনি। ছেলে ডা. রাজকিরণ সাহা বর্তমানে বাসাইল উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন এবং করোনা রোগীদের সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কনিষ্ঠপুত্র প্রণয় সাহা ঢাকায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই বিষয়ে অধ্যয়নরত। কন্যা রাজলক্ষ্মী এমবিএ পাস করার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং একমাত্র কন্যার জামাতা শ্রীমান সজীব ডেপুটি পরিচালক (অর্থ) হিসেবে পিডিবিতে কর্মরত।

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই (ফাকরী)

লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ব্যবহারই মানুষের পরিচয় বহন করে। নম্র ভদ্র বিনয় মানুষের বড় একটি গুন। এমনই একজন সদা হাস্যজ্জল বিনয়ী মানুষ আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই (ফাকরী)। সাহিত্যের রসে সিক্ত এই মানুষটি খুবই অতিথি পরায়ন। সাহিত্য জগতে বিচরণ তার অনেক আগে থেকেই। লিখে যান আপন মনে। কিন্তু সুপ্ত প্রতিভা গুপ্তই থেকে যায়। অনাবরত কবিতা নাটক লিখে গেলেও তা আর আলোর মুখ দেখতে পায় না। মনের যত আকুতি কবিতা আকারে খাতার পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। তিনি শুধু একজন কবিই নন একাধারে নাট্যকার ও ভালো ফুটবল খেলোয়ার এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। এই নানা প্রতিভাধর আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই যিনি স্বজনদের মাঝে ফাকরী নামে পরিচিত। তার জন্ম ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন পাকুল্লা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা হাবীবুর রহমান খান ইউসুফজাই ছিলেন জমিদার পরিবারের, পরবর্তীকালে সরকারি চাকরিজীবী। কৃতী ফুটবলার হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন।

পাকুল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজমীর রহমান খান ইউসুফজাইয়ের লেখাপড়া শুরু। জামুর্কী নবাব স্যার আবদুল গণি উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন সা'দত কলেজ, করটিয়া হতে ঐ একই কলেজ হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ভর্তির প্রক্রিয়াকালীন চাকরিতে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ৪২ বছর চাকরি জীবন, সুদীর্ঘ সংসার জীবন। সুখময় সংসারে তিন কন্যা উর্মী, গোধূলী ও তূর্ণা। সহধর্মিণী কুইন ইউসুফজাই। লেখালেখির জগতে নিত্য বসবাস। স্কুল- কলেজে অধ্যয়নকালীন সাহিত্য জগতে পদার্পণের দীর্ঘসময় জাতীয় পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গোধূলী'। এলাকার মসজিদ মাদ্রাসায় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন রেজিষ্টার্ড অগ্রণী যুব সংঘ পাকুল্যা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ৭১- এর রণাঙ্গনে তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠক ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। তিনি পুর্বাঞ্চল ও অর্নিবান পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি নিজের পরিচালনায় পথ নাটক-গ্রাম্যনাটক, মঞ্চ নাটক পরো খুলনা অঞ্চলে মঞ্চায়িত হয়েছে। যার হাত ধরে নাটকে প্রবেশ তিনি হলেন টাঙ্গাইলে কৃতি সন্তান তৎকালিন জেলার ডিসি আজহার আলী তালুকদার। তার নিজস্ব সংগঠন নব দিগন্ত নাট্য গেষ্ঠি ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য পদ লাভ করেন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি একাধারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক

খেলাধুলার সাথে জড়িত ছিলেন। তবে তার লেখা নাটক যেমন, চোখের দৃষ্টি, জলসা ঘর, বিজয়ের উল্লাস, অভাগা, আকাশ ছোয়া স্বপ্ন, রাজার বাড়ীর নিমন্ত্রণ, কালোছায়া আরও অসংখ্য নাটক মঞ্চেও মঞ্চায়াত হয়। তার লেখা কাব্যগ্রন্থ' গোধুলী' ও উপন্যাস- প্রেমের মৃত্যু নাই, ছন্নছাড়া, আত্মত্যাগ, ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা প্রকাশ হয়েছে। বর্তমান তার হাতে অনেক কবিতা বই গল্প, উপন্যাস, লেখা রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায় তবে এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনায় বাংলাদেশ প্রকাশ হওয়ার পথে। তার সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হলেও যে জীবনে গাদ প্রতি গাতের ভিতর দিয়ে মানুষে তার বিজেএমসির মেসার্স লতীফ বাওয়ালী জুট মিলে ম্যানেজার পদ হতে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন। তার অবসর সময় লেখা লেখি নিয়ে কাটে।

৪- ছাত্র জীবনে তিনি প্রাইমারি, হাইস্কুল, গ্রাম গঞ্জে, উপজেলা জেলা টিমে খেলেছেন। টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে ইষ্টান ও সাবালিয়া হয়ে খেলেছেন তাছাড়াও বিভিন্ন স্টেডিয়ামে কৃতি ফুটবলার হিসেবে খেলে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৭৭-৭৮ বিজে এসপি হয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে। পরে ১৯৭৮ এ-চাকরির সুবাদে ময়মনসিংহ জুটমিলস হয়ে ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে ও মহামেডান ও আল হেলাল টিমে খেলেছেন। খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগায় খেলা বন্ধ হয়ে গেলে পরে সুস্থ্য হলে কলেজ ও জাতীয়ভাবে ক্যারামবোর্ড ও বেমমিন্টন অংশগ্রহন করেন।

তিনি খেলাধুলায় যেমন পারদর্শি ছিলেন তেমনি পারদর্শি ছিলেন গান বাজনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ১ম ও ২য় পুরস্কার লাভ করেন দেয়াল পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

তিনি এবং তার সহধর্মিণী প্রখ্যাত সাহিত্যিক নওশের আলী খান ইউসুফজাইর উত্তরসুরী। আজমীর রহমান নবদিগন্ত সাহিত্য সংগঠনের উপদেষ্টা, ছায়ানীড়ের আজীবন সদস্য।

তিনি ছায়ানীড় সম্মাননা ২০২৪ লাভ করেন। এছাড়াও ছায়ানীড় আয়োজিত কলমসৈনিক কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন এবং সনদপ্রাপ্ত হন।

মো. শরীফ উদ্দিন খান দীপু

পরিচালক, পিংকী চলচ্চিত্র

মো. শরীফ উদ্দিন খান দীপু টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার কাঞ্চনপুর কাজিয়াপাড়ায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শওকত আলী খান, মাতা দুধ বেগম। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলে লেখাপড়া শুরু।

করটিয়া এইচএম ইনস্টিটিউটে নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে বর্ণী হাই স্কুল হতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাস করে সা'দত কলেজ, করটিয়া ভর্তি হন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আইডিয়াল কলেজ হতে এইচএসসি পাস করেন। খুলনা দৌলতপুর কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। খুলনা পিপল জুট মিলস-এ সুপারইভাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সফল পদচারণা ছিল। ফিরোজ আল মামুন পরিচালিত কালপুরুষ- এর প্রযোজক হিসেবে শরীফ উদ্দীন খান দীপু চলচ্চিত্র জগতে আত্মনিয়োগ করেন। 'দেশদরদী' ছবির পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে দক্ষতার সাথে পেশাগত কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অদ্যাবধি বাংলাদেশের অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিংকী চলচ্চিত্র-এর পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সংগঠক হিসেবে জিয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক ফোরাম-এর পক্ষ থেকে পদক প্রাপ্ত হন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শাহেদা শহীদ খানের সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে ২ পুত্র যথাক্রমে সালাউদ্দিন খান অপু ও শিহাব উদ্দীন খান তপু, একমাত্র কন্যা সোহানা শরীফ খান পিংকি।

সমাজসেবায় বিশেষ অবদান: ঢাকাস্থ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্র পরিষদের সভাপতি। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। কাঞ্চনপুর এলাহিয়া সিনিয়র কামিল মাদ্রাসার বিদ্যোৎসাহী সদস্য। টাঙ্গাইল জেলা সমিতির আজীবন সদস্য।

সাক্ষাৎকারে মো. শরীফ উদ্দিন খান দিপু বলেন, বৈদেশিক অপসংস্কৃতির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে স্বদেশের সংস্কৃতি, তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের অতীত ঐতিহ্য। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই সত্যিকারের স্বদেশপ্রেম।

সালাম সাকলাইন

নাট্যকার ও সংগঠক

মেধাবী নাট্যকার ও সংগঠক সালাম সাকলাইন টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার বেংরোয়া গ্রামে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল আজিজ এবং মাতার নাম রাশিদা বেগম।

তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গৌরাঙ্গী-একাশী ওসমানিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। এরপর ঘাটাইল জিবিজি কলেজ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পাস করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে অনার্সসহ বিএ এবং এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করছেন।

সালাম সাকলাইন স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কলেজ জীবনে দেয়াল পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। জিবিজি কলেজ ম্যাগাজিন 'কিংশুক' সম্পাদনার কাজ যখন শুরু করেন, তখন ছাত্র সংসদ গঠিত হয়নি। পরে হায়দার রাহমানের সম্পাদনায় কিংশুক প্রকাশনা শুরু হয়। তার অনেক লেখা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি স্কুল-কলেজে পড়ার সময় এলাকায় বিভিন্ন নাটক পরিচালনা ও অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে-বিদেশে তার নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে। তার 'কারিগরনামা' নাটক ভারতে ১৪৫ বার মঞ্চস্থ হয়েছে। এছাড়া টেলিভিশনে তার কয়েকটি নাটক প্রচারিত হয়েছে। তিনি দেশের প্রথিতযশা নাট্যকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে যোগদান করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে নয়ারহাট বংশাই থিয়েটার, ঘাটাইল থিয়েটার, গৌরাঙ্গী থিয়েটার হামিদপুর থিয়েটার গড়ে ওঠে এবং নাট্য আন্দোলন জোরদার হয়। বংশাই থিয়েটার ও গৌরাঙ্গী থিয়েটারের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন নাট্যোৎসবে দেশবরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেন। এসব নাট্যোৎসবে অন্যান্য নাট্যকারের সাথে তার রচিত নাটকেরও সফল মঞ্চায়ন হয়। নাটক রচনাতেও সালাম সাকলাইনের প্রসংশনীয় দক্ষতা রয়েছে। এ সকল নাটকে তিনি গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন উপাখ্যান নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন। তার রচিত আলোচিত নাটকগুলোর মধ্যে চোর, জাহেন আলিরে ধর, হামেদালির স্বর্গদর্শন, কারিগরনামা, শিবানী সুন্দরী, বুননকারিগর, বানরের পিঠাবন্টন ও সেনেরখিলের তালুকদার উল্লেখযোগ্য। তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ 'প্রমথনাথ চৌধুরী গোল্ডমেডেল' ও আলাওল পুরস্কার লাভ করেছেন।

তিনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুল হক খান বেনুর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেই বালক বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সহজসাধ্য ছিলো না। পারিবারিক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি ছুটে যান যুদ্ধে। তিনি কালিদাসপাড়া, ভূঞাপুর, গোপালপুর, হামিদপুর, কদমতলি, কালিহাতি ও এলেঙ্গা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। কদমতলী যুদ্ধে তিনি আহত হন। কালিদাস পাড়া যুদ্ধে আহত শাহাবুদ্দিনকে নিয়ে তিনি ফলদা চলে যান। কিন্তু পথিমধ্যে শাহাবুদ্দিনকে নিয়ে তিনি ফলদা চলে যান। কিন্তু পথিমধ্যে শাহাবুদ্দিন শহীদ হলে তাঁকে তার গ্রামের বাড়ি বাগুনডালি গ্রামে পৌঁছে দেন। মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের অদূরে ছত্রীসেনারা পাক বাহিনীর উপর হামলা চালালে হাবিবুল হক খানের কোম্পানি বাঘিল ও ইছাপুর তাদের সহযোগিতা করে। তখন সালাম সাকলাইনও সেই কাজে বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে তিনি আবার স্কুলে ফিরে যান।

তিনি বিবাহিত, স্ত্রী শাহনাজ সালাম সুগৃহিণী। দুই কন্যা– সুহী ও তিরিশ্চনার জনক।

আবু হানিফ

অভিনেতা, পরিচালক ও সাংস্কৃতিক কর্মী

টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মো. আবু হানিফ অন্যতম। ছোটবেলা হতেই নাটক এবং সংস্কৃতির প্রতি ছিল তার প্রবল ঝোঁক। অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মঞ্চ নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশ। অদম্য উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তিনি ধীরে ধীরে ছোট পর্দা এবং বড় পর্দায় অভিনয় করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের ছোট বাসালিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজআলী কৃষিজীবী ছিলেন। মাতা আয়তন নেছা। চারবোন দুই ভাইয়ের মধ্যে মো. আবু হানিফ চতুর্থতম। মঞ্চ নাটকে তিনি সাবলীল অভিনয় করে দর্শক-স্রোতাদের মন কুড়িয়েছেন। তার অভিনিত মঞ্চ নাটকগুলো হচ্ছে কে দস্যু, এক মুঠো অন্ন চাই প্রভৃতি। টেলিভিশনে ধারাবাহিক– সাক্ষী কুটুম নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়াও প্রিন্স ওয়াজেদ রচিত ও পরিচালিত 'লক্ষ্মীর জান' গীতিনাট্যে অভিনয় করেন।

আজিজ আহম্মেদ বাবুল-এর পরিচালনায় ঢাকার কুতুব চলচ্চিত্রে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক শ্রোতাদের মন কাড়েন। প্রতিবাদী মাস্টার চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেন। নাটকে তার হাতেখড়ি ওস্তাদ শয়ান উদ্দীন ও সামাদ তালুকদারের কাছ থেকে। তাকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনুপ্রেরণা এবং আলোর পথে নিয়ে আসার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হচ্ছেন লায়ন নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও নাজ গ্রুপ অব কোম্পানির চেয়ারম্যান লায়ন মো. নজরুল ইসলাম। তার সহযোগিতা ও স্নেহে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পাশাপাশি ব্যবসায় অঙ্গনেও পথ চলছেন। লায়ন মো. নজরুল ইসলামই মো. আবু হানিফের ব্যবসায়িক জীবনের পথিকৃৎ। অর্থনৈতিকভাবে তিনি মো. আবু হানিফকে সহযোগিতা করতেন।

রাজু আহমেদ প্রযোজিত আবু হানিফের কাহিনি চিত্রনাট্যরূপ ও পরিচালনায় হাসির নাটক টাকার জ্বালা, সিডি ক্যাসেট সর্বত্র পাওয়া যেতো।

মো. আবু হানিফ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মোছা. মর্জিনা-এর সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মো. আবু হানিফ দুই ছেলে এক মেয়ের জনক। বড় ছেলে রাজু আহমেদ। মেয়ে লিজা আক্তার মলি এবং ছোট ছেলে রেজাজ আহমেদ আজম।

ব্যস্ততার মাঝেও মো. আবু হানিফ কাজ করে যাচ্ছেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।

লায়ন নজরুল ইসলাম সাহেবের জীবনী অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন টেলিফিল্ম 'একটি স্বপ্ন'।

মো. আবু হানিফ টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকার সহ-ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জাকির খান

নাট্যব্যক্তিত্ব ও সংগঠক

জাকির খান একজন প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠক ও অভিনেতা। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন অন্তর্গত গয়হাটা গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মো. দানেশ আলী খান ছিলেন চাকরিজীবী। মাতা মুক্তা বেগম।

তিনি নাগরপুর সরকারি কলেজ হতে গ্রাজুয়েশন (বি.এ) ডিগ্রি লাভ করেন। টাঙ্গাইলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সফলভাবে বিচরণ করার পাশাপাশি ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটিতেও কাজ করেছেন। মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার গুণে স্বল্প সময়ের মধ্যে জুনিয়র থেকে সিনিয়র হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৬ বছর সফলতার সাথে কাজ করেছেন।

১ম অভিনয়- ১৯৭৪ ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নাটিকাতে মেয়ে চরিত্রে। কম পক্ষে ৫টি নাটক ও যাত্রা মঞ্চে মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি গয়হাটা উদয়তারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের বাৎসরিক নাটকে লচরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। গয়হাটা পুবালী সংঘ এবং মিতালী সংঘের অসংখ্য নাটক ও যাত্রাপালায় অভিনয় করে দর্শক মাতিয়েছেন, জাকির খান কলেজ মঞ্চেও একজন নন্দিত অভিনেতার সম্মান পেয়েছেন। চাকরির সুবাদে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল শহরে আগমন। টাঙ্গাইল পূর্ব আদালত পাড়াস্থ সুরবাণী ক্লাবের মাধ্যমে স্থানীয় ভাসানী হলে ১ম অভিনীত মঞ্চ নাটক "রক্ত দিয়ে লেখা"। তারপর একই ক্লাবের হয়ে ভাসানী হলে মোঘলে আযম এবং মা-মাটি মানুষ নাটকে অভিনয় করে দর্শক নন্দিত হোন তিনি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে থিয়েটার, টাঙ্গাইলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাংগঠনিক অভিযাত্রা শুরু করেন জাকির খান।

মঞ্চ অভিনয়ের পাশাপাশি সাংগঠনিক দক্ষতার সাথে ঐ সময়ে টাঙ্গাইল- ঢাকার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াসে পরপর কয়েকটি নাট্য উৎসবের সফল পরিসমাপ্তি-তে ভূমিকা রাখেন। ১৯৯২-২০০০ পর্যন্ত ৮ বছরে থিয়েটার টাঙ্গাইলের ব্যানারে নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে থিয়েটার স্কুল এবং থিয়েটার লাইব্রেরি।

আদর্শগত মত পার্থক্যের কারণে থিয়েটার টাঙ্গাইল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ৭ জুলাই ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'টাঙ্গাইল থিয়েটার'। তুমুল প্রতিযোগিতা আর প্রতিকূলতা পেরিয়ে টাঙ্গাইল থিয়েটারকে বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইল থিয়েটার

দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। নাটক নির্মাণ, চর্চা ও প্রচারে এর অবদান অনস্বীকার্য। টাঙ্গাইল থিয়েটারের সফল প্রযোজনায় ড. আশরাফ সিদ্দিকীর গল্প অবলম্বনে আমিনুর রহমান মুকুল পরিচালিত 'ফুলকুমারী', জসিম উদ্দিনের 'মধুমালা', 'বেদের মেয়ে' এবং নাট্যজন গোলাম আম্বিয়া নুরীর 'বাকতলীর পরী'। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হিসেবে তিনি বিবেচনা করেন মধুমালা নাটকের মদন কুমার চরিত্র, যদিও বাকতলীর পরী নাটকে বৃদ্ধ মাস্টারের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন।

জাকির খান তার প্রতিভার ফুল দিয়ে মালাগাঁথতে পারেননি। তিনি একাধারে অভিনেতা, সংগঠক, গায়ক, উপস্থাপক এবং লেখা-লেখিতেও সম্ভাবনাময়। বিশেষ করে সুরের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন, আপন প্রতিভায় যে সুর তার কণ্ঠে অনুরণিত হয়, সাধনার সাগর সেঁচে নয়, ঝিনুকের মাঝেই তিনি মুক্তো কুড়োতে পারতেন, তবুও দর্শক তার গানে মুগ্ধ।

সামাজিক সংগঠক হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে তার। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সক্রিয়। নিসচা টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন। টাঙ্গাইল জেলায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তি হিসেবে যাদের অবদান অনস্বীকার্য সম সাময়িক উত্তরসূরি হিসেবে জাকির খান অন্যতম; তিনি স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদ, আমলা, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের আশির্বাদপুষ্ট হয়েছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন নিয়মিত তালিকাভুক্ত নাট্যশিল্পী এবং এই নিরলস নাট্যশিল্পী স্থানীয়-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও কাজ করেছেন। ইতোমধ্যে ইউটিউবে প্রচারিত 'তিন মাতালের কাণ্ড' মুভিটি দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

তিনি বহুবিদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন : বাংলাদেশ হেরিটেজ স্টাডি এন্ড ডেভেলপমেনট ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল জেলা শাখা এবং কানাডা শাখার সভাপতির যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিরাপদ সড়ক চাই, টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ভারত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মৈত্রী পরিষদ, কানাডা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা সংগঠন 'ছায়াবীথি' এর আজীবন সদস্য ও উপদেষ্টা।

একজন শৌখিন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সুধীমহলে তার যথেষ্ট সুপরিচিতি রয়েছে। বিভিন্ন মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করে ব্যাপক সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে অতি সুপরিচিত 'টাঙ্গাইল থিয়েটার' এর মাধ্যমে জাকির খান দেশের নাট্য আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি প্রায় ৫০ বছরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ে সম্মাননা পদক, সনদ ও পুরস্কার লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

১) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে নাট্যাৎসব উপলক্ষে হঠাৎ নাট্য সম্প্রদায়, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল হতে সফল নাট্যাভিনেতা হিসেবে সম্মাননা লাভ করেন।

২) ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশনা সংস্থা 'ধূসর পাণ্ডলিপি' ঢাকা হতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখায় সম্মাননা পদক লাভ করেন।

৩) ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান ২০১৬ হতে সরকারি এম এম আলী কলেজের সিনিয়র রোভারনেট হিসেবে তাকে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

৪) ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ছায়াবীথি কর্তৃক প্রকাশনা উৎসব ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হতে তাকে সফল সঞ্চালক হিসেবে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

৫) ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পাঠাগার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় তাকে বাংলাদেশ হেরিটেজ স্টাডি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

৬) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মৈত্রী পরিষদ, টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে তিনি সম্মাননা পদক গ্রহণ করেন।

৭) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নাট্যাঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় শিল্পী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক তাকে সম্মাননা প্রদান করেন।

৮) ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ছায়াবীথি কর্তৃক প্রকাশনা ও গুণীজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রায় ৫০ বছর (১৯৭৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত) কোন প্রাপ্তির বিবেচনায় নয় মা-মাটি মানুষকে ভালবেসে আপাদমস্তক সাংস্কৃতিক চর্চায় অবগাহন করে আছেন জাকির খান। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি মাছরাঙ্গা টেলিভিশন একজন নিভৃতচারী সাংস্কৃতিক কর্মী শিরোনামে 'রাঙা সকাল' (১ ঘণ্টা একক) অনুষ্ঠানে জাকির খানকে উপস্থাপন করেছিল, ধন্যবাদ মাছরাঙা টেলিভিশনকে, সুবিধা বঞ্চিত, নিবেদিত প্রাণ, বিশুদ্ধ একজন সাংস্কৃতিক কর্মীকে জাতীয় পর্যায়ে সম্মান দেয়া এবং আত্মকথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর তিনি টাঙ্গাইল কালচারাল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক চর্চাকে প্রাণবন্ত এবং উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করছেন।

গত ৫০ বছরের সাংস্কৃতিক পথ পরিক্রমায় যে কাজটুকু তিনি করেছেন তার প্রতি আমাদের স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধা রইল প্রতিভার প্রতিটি স্তরে বিকশিত হোক তার জীবন কর্ম।

ইতি নিয়োগী
সঙ্গীত শিক্ষক

টাঙ্গাইল জেলার আকুরটাকুর পাড়া বটতলার মধ্যবিত্ত পরিবারে ইতি নিয়োগীর জন্ম হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। পিতা ক্ষেত্র মোহন চন্দ ও মাতা ঊষা রাণী চন্দ। ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনিই কনিষ্ঠ। বড় ভাই রবি চন্দ সেতার বাজাতেন, মেজো ভাই মণি চন্দ তবলা বাজাতেন, বড় দুই বোন গান করতেন। ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন তিনি। অসম্ভব দুরন্ত এই মেয়ের সময় কেটেছে দুরন্তপনায়। তার প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয় বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় হতে। এখান থেকে মাধ্যমিক পাস করে তিনি কুমুদিনী মহিলা কলেজ হতে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। পড়ালেখার অদম্য ইচ্ছার কারণে ১২ বছর পর তিনি ডিগ্রি পাস করেন।

সঙ্গীত জীবন: সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় সঙ্গীত জ্ঞান তার ছোটবেলা থেকেই ভালো। তবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে পারিবারিক অর্থ সংকটের ফলে তার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হয়। সে সময় তিনি শুনে শুনে গান চর্চা করতেন। পরে তার হাতেখড়ি হয় সুধীর কর্মকাণ্ডের নিকট। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীতে প্রশিক্ষণে ওস্তাদ চান মোহন দাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারই প্রশিক্ষণে তিনি উচ্চাঙ্গ ও নজরুল সঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সাকরাইলের জমিদারবাড়ির পুত্র অমর সিংহ নিয়োগীর সাথে তার বিয়ে হয়। অমর সিংহ নিয়োগী নিজেও তবলাবাদক হওয়ায় তিনি সঙ্গীতে এগিয়ে যাওয়ার এক বড় অবলম্বন পান। স্বামী ও তার শাশুড়ি রুমীনী বালা নিয়োগীর আগ্রহে তার শিক্ষা শুরু হয় ঢাকার বারী খানের নিকট। বারী খানের মৃত্যুর পর ওস্তাদ মফিজুল ইসলাম, বারীন মজুমদার, ডা. হারুন-অর রশিদের নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাই দুই মেয়ে ও এক ছেলে সবাই সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি টাঙ্গাইলের জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া জেলা শিশু একাডেমি, বিজিএস, আনন্দ সঙ্গীত একাডেমি, মাওলানা ভাসানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি তার নিজের 'সুরছন্দা' সঙ্গীত একাডেমি ও ঢাকা নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত নজরুল একাডেমি মধুপুর শাখায় কর্মরত আছেন। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় তার ছাত্র-ছাত্রীরা বিগত বছরগুলোতে একাধিক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে। ছোটবেলা থেকে শুরু হওয়া সঙ্গীতের সাধনা আজও অব্যাহত আছে একইভাবে। সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা।

আমজাদ কবীর চৌধুরী
অতিথি প্রযোজক, এটিএন বাংলা

খ্যাতিমান টিভি অনুষ্ঠান নির্মাতা, লেখক, কাহিনিকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার কোলাহা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন, মাতা মোসাম্মৎ আমেনা বেগম। ছেলেবেলায় একাশী প্রাইমারি ও হাইস্কুলে তার লেখাপড়া শুরু। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঘাটাইল গণ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ঘাটাইল ব্রাহ্মণশাসন গণমহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে গোপালপুর কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্কুল থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির হাত ছিল। বংশাই সাহিত্য সংসদের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। গাঙচিল পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপা হতো, কলেজ দেয়ালিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত কবিতার সংকলন 'চাঁদ সিঁড়ি' প্রকাশ হলে তা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতেও প্রশংসিত হয়।

ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিকমনা থাকায় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই মেজোভাই এফ. কবির চৌধুরীর সাথে চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালনার কাজ করেন।

এরপর এটিএন বাংলায় অতিথি প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন, এখনো করছেন। ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক-২০০৮' তার হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার নির্মিত টিভি অনুষ্ঠান কিছুক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিবেক, প্রাপক ডট.কম ব্যাপক দর্শকনন্দিত হয়।

তিনি বিবাহিত এবং দুই কন্যার আদর্শ পিতা।

মিতা হক

২০২০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত

মিতা হক রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী হিসেবে অতি পরিচিত এক মুখ। শুধু টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরেই তার সুনাম সীমাবদ্ধ নয়, বাংলাদেশসহ বিদেশের মাটিতেও তার সুনাম ছড়িয়ে আছে। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মা খুব ভালো সঙ্গীত করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারে বড় হওয়ায় গানের জন্য আলাদা কোনো স্কুল বা একাডেমিতে ভর্তি হননি।

প্রথমে চাচা ওয়াহিদুল হক এবং পরে ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খালেক ও সনজিদা খাতুনের কাছে বাড়িতেই গান শেখেন। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেনের কাছ থেকেই তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ চলতে থাকে।

তিনি সবসময় দুই বাংলার খ্যাতিমান শিল্পী কণিকা বন্দোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, সুচিত্রা মিত্র, এপার বাংলার সনজিদা খাতুন ও ফাহমিদা খাতুনের গান শুনতেন। শুধু তাই নয় সবসময় তাদের অনুসরণও করতেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্লিন আন্তর্জাতিক যুব ফেস্টিবালে অংশ নেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি তবলা বাদক মোহাম্মদ হোসেনের কাছে গান শেখা শুরু করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়মিত তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে সঙ্গীত পরিবেশনা করেন।

তিনি বাংলাদেশ বেতারের সর্বোচ্চ গ্রেডের তালিকাভুক্ত শিল্পী। তার এককভাবে মুক্তি পাওয়া মোট ২৪টি অ্যালবাম আছে। এরমধ্যে ১৪টি ভারত থেকে ও ১০টি বাংলাদেশ থেকে মুক্তি পায়।

তিনি সুরতীর্থ নামে একটি সঙ্গীত প্রশিক্ষণ দল গঠন করেন যেখানে তিনি পরিচালক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তিনি ছায়ানটের রবীন্দ্র বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন।

সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

এছাড়াও তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিল্পকলা পদক লাভ করেন। এরপর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

একই বছর চ্যানেল আই প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত রবি-চ্যানেল আই রবীন্দ্রমেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মিতা হককে সম্মাননা দেওয়া হয়।

মিতা হক অভিনেতা ও পরিচালক খালেদ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খালেদ খান ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। স্বামী খালেদ খান শিল্পকলায় অভিনয় শাখায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার (মরণোত্তর) ২০২২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত করেছেন। এই দম্পতির কণ্ঠশিল্পী ফারহিন খান জয়িতা নামে এক কন্যা সন্তান রয়েছে।

তিনি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদুজ্জামান সেলিম

জননন্দিত অভিনেতা, লেখক, পরিচালক

জননন্দিত অভিনেতা, লেখক, পরিচালক শহীদুজ্জামান সেলিম। পিতা আসাদুজ্জামান খান এবং মাতা শামসুন্নাহার খান। তার জন্ম ০৫-০১-১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। পেশা অভিনয় ও পরিচালনা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ড্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেড। শহীদুজ্জামান সেলিমের শিশুকাল কেটেছে পাকিস্তানের করাচীতে। পরবর্তীকালে লেখাপড়ার শুরু টাঙ্গাইল জেলার বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। তৃতীয় শ্রেণিতে এসে ভর্তি হন ঢাকার শান্তিবাগ কো-অপারেটিভ হাইস্কুলে। দুই বছর পর পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন আইডিয়াল হাইস্কুলে। সেখান থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রথমে নটরডেম কলেজে এবং পরবর্তীকালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শহীদুজ্জামান সেলিমের পৈতৃকবাড়ি ঘাটাইলের কান্দুলিয়া।

তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন এবং ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। জাসদ সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে প্রথমে মীর মোশাররফ হোসেন হল শাখার সহক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'জাকসু' নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন। খেলার মাঠের সক্রিয় সেলিম একসময় নাটকের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং শুরু হয় তার বর্ণিল অভিনয় জীবন। শফিক ইমতিয়াজ রচিত ও ফারুক আহমেদ পরিচালিত 'আবার বাউল আইবো ফিরা' তার প্রথম অভিনীত নাটক। ঐ বছর আন্তঃ হল নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। এরপর থেকে মেধাবী ছাত্র ও মাঠের খেলোয়াড় রূপান্তরিত হয় একজন তুখোড় অভিনেতা হিসেবে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সমমনা ১১ জনকে নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার গঠন করেন। নতুন নাটক কায়জার আহমেদের রচনা ও পরিচালনায় 'কারখানার বাঁশি'তে অভিনয় করেন। জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের সদস্য হিসেবে চোর, জাহেন আলীরে ধর, বাসন, সায়ফুল মূলক বদিউজ্জামালসহ বহু নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনাসহ নেপথ্য কর্মী হিসেবে মুখ্য ভূমিকা রাখেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত মুক্তমঞ্চের উদ্বোধন হয় তার অভিনীত সেলিম আল দীনের 'শকুন্তলা' নাটকের মাধ্যমে।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের দমনমূলক মজিদ খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারাদেশে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই সময় তার রচনায় ও অভিনীত 'বায়ান্নের শকুন' নামক পথনাটকের প্রদর্শনী হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও আশে-পাশের এলাকায়। ফলেই স্বৈরাচারী

এরশাদের সেনাবাহিনী মীর মোশাররফ হল ঘেরাও করে ছাত্র-শিক্ষক ও নাট্যকর্মীসহ ২০-২২ জনকে আটক করে। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নাটকের মাধ্যমে বক্তব্য দেয়া ও ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে ৭ দিন সাভার সেনানিবাসে আটক থাকতে হয়। এই বন্দীকালীন তার উপর চলে অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে নাগাদ তিনি দেশের প্রথিতযশা নাট্যদল ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। শুরু হয় ঢাকার নাট্যকর্মী হিসেবে নিজের পদচারণা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাতহদাই, ধূর্তউই, একাত্তরের পালা, প্রাচ্য, বনপাংশুল, চাকা, ধাবমানসহ ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত প্রায় সকল নাটকেই সেলিম মূল চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় অনার্স শেষ করার পরই একটি বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিতে চাকরি নেন। পরে চাকরি অবস্থায় মাস্টার্স শেষ করেন।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিটিভির নিজস্ব শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্তির পর থেকেই তার টেলিভিশনে অভিনয়ের সূত্রপাত। এই সময় তিনি সাহচর্যে আসেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, আতিকুল হক চৌধুরী, রিয়াজ উদ্দিন বাদশা, ফিরোজ মাহমুদসহ বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্মাতাদের। এই সাত–আট বছরে বহু জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের শেষে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, শহীদুল্লাহ খান, অপূর্ব মজুমদার, শাহাদাৎ চৌধুরী ও সেলিম মিলে গড়ে তোলেন নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ড্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেড। বর্তমান সময়ের অনেক জনপ্রিয় পরিচালক, লেখক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর কর্মজীবন শুরু এই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়- স্পর্শের বাইরে, কর্নেট, গৌরচন্দ্রিকা, প্রত্ননারী, আগন্তুক, লি, রঙছুটসহ বহু জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক, টেলিফিল্ম ও খণ্ড নাটক।

বাংলাদেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দক্ষ ও সুস্থ শিল্পী এবং কলাকুশলী গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম। সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের যাত্রা শুরুই হয়েছে তার পরিচালিত নাটক দিয়ে।

ড্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেড আমেরিকা, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ বহু দেশের নির্মাতাদের সাথে যৌথভাবে পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছে বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, নাটক ও চলচ্চিত্র।

পুরস্কার ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এক বা একাধিকবার অভিনেতা বা পরিচালক হিসেবে কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। স্ত্রীর নাম রোজী সিদ্দিকী। তিনিও জনপ্রিয় অভিনেত্রী। দুই কন্যা সন্তানের জনক সেলিম। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সেলিমই বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। আইনজীবী পিতা ও পিতামহের ইচ্ছা ছিলো পারিবারিক আইন ব্যবসায় অংশ নেবেন সেলিম। কিন্তু তা না করে নিজের স্বপ্নকে অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে হয়ে গেলেন স্বপ্ন নির্মাণের কারিগর।

কালীপদ শীল

সাবেক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা

মানুষের আত্মার খোরাক জোগায় সঙ্গীত। এই সঙ্গীতকে যারা মনে প্রাণে ধারণ করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন কালীপদ শীল। একজন সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ তিনি।

তার জন্ম ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল নাগরপুর উপজেলার পাইকাইল গ্রামে। পিতা হীরালাল শীল। মাতা সুধারাণী শীল। দুই ভাই তিন বোনের মাঝে তিনি দ্বিতীয়।

পাইকাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আইন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। তালুকনগর মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রাইভেট থেকে বিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চমান সহকারী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯90 খ্রিস্টাব্দে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

তিনি মাটির সুর সঙ্গীত পরিষদ এবং লোকাঙ্গন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সঙ্গীত চর্চা করে যাচ্ছেন। জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে তার একক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তিরাণী শীলের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের সুখময় সংসারে শোভা বর্ধন করেছে দুই সন্তান। ছেলে প্রশান্ত কুমার শীল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি ডিগ্রিপ্রাপ্ত। মেয়ে স্বর্ণারাণী শীল লালমাটিয়া কলেজে লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে অধ্যয়নরত।

আবদুস সালাম

চেয়ারম্যান, একুশে টেলিভিশন

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তথ্য ও বিনোদন প্রচারে যে নান্দনিক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে সে ধারার অন্যতম পথিকৃৎ আবদুস সালাম। বর্তমানে দেশের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ টি.ভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান।

তার জন্ম ১৯৬৪ খ্রি. ১৪ জুলাই। পিতা এম.এ. করিম ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। পিতার মহানুভবতা ও উদারতা সন্তানের মাঝে সঞ্চালিত হয়। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার শাহজানী গ্রামে।

আবদুস সালাম জন্মগতভাবেই মেধাবী। কোন প্রতিকূলতাই তাঁর সাফল্যের পথ রোধ করতে পারেনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেখাপড়া এদেশেই সুসম্পন্ন করে ১৭ বছর বয়সে জার্মানিতে চলে যান। ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যবসা ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে তিনি ডিপ্লোমা কোর্স সুসম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনের সাফল্য: জার্মানিতে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করলেন। কর্মের প্রতি তাঁর অদম্য স্পৃহা। জার্মানিতে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। পোশাক শিল্পে একজন ইম্পোটার হিসেবে তিনি স্বল্প সময়ে সুখ্যাতি লাভ করেন। জনপ্রিয় বায়ারার হিসেবে তাঁর অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে, যা সত্যিই ব্যবসায়ী মহলে ঈর্ষণীয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গড়ে তোলেন স্কয়ার সারা ফ্যাশন, যার কার্যক্রম দেখতে বাংলাদেশে এসেছিলেন পৃথিবী খ্যাত প্রতিষ্ঠান নাইকির ম্যানেজার। ব্যবসায়িক জগতে তাঁর সুখ্যাতি বিস্তৃত হয় দেশ ও বহির্বিশ্বে।

সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন: ওয়ান ব্যাংক লি., ইউনিয়ন ক্যাপিটাল, নিউজ টুডে, ইউনিডেভ প্রডাকশন লি. ও ইউনিনেট লি.। সমাজসেবা ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা: পেশাগত শত ব্যস্ততার মাঝেও দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় তিনি আত্মনিবেদিত। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'এম.এ. সালাম নার্সিং ক্লাব', চৌহালী ডিগ্রি কলেজে রয়েছে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা, চৌহালী আর.আর.কে. উচ্চ বিদ্যালয় ও এম.এ. করিম উচ্চ বিদ্যালয়, নাগরপুরে তাঁর আর্থিক অনুদান ও সাহায্য সহযোগিতা রয়েছে। দেশ ও বহির্বিশ্বে বহু সমাজসেবামূলক সংগঠনে সম্পৃক্ততা রয়েছে।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি: উল্লেখযোগ্য-

১) অর্থকণ্ঠ ব্রিলিয়ান্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বিজনেস এওয়ার্ড-২০০২
২) ঢাকা কোলকাতা কালচারাল ফোরাম সম্মাননা সনদ
৩) রফিকুল ইসলাম ব্যাংকিং এওয়ার্ড-২০০৬
৪) অর্থকণ্ঠ বিজনেস পারসন অব দ্যা ইয়ার-২০০৪
৫) চিলড্রেন এ্যান্ড ওমেন ভিশন ফাউন্ডেশন গুণিজন সম্মাননা-২০০৭
৬) নাট্যসভা কর্তৃক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মাননা প্রদান
৭) শাহজানী সমাজ কল্যাণ পদক
৮) টাঙ্গাইল জেলাবাসীর পক্ষ থেকে সমাজসেবা পদক

ব্যক্তি সাফল্যের পাশাপাশি একুশে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তার জন্য অর্জন করেছেন দুর্লভ সম্মাননা । উল্লেখ্য:

১) সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি পুরস্কার-২০০০
২) মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার-২০০২
৩) চ্যানেল আই পুরস্কার-২০০২
৪) আশিয়ান সিটি ট্রাস্ট অ্যাওয়ার্ড-২০০৬
৫) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ ঢাকা বইমেলা পুরস্কার-২০০৭

সফল শিল্পদ্যোক্তা, আত্মপ্রত্যয়ী, মেধা ও মননশীল আবদুস সালাম স্বদেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে চলে আসেন সবুজ শ্যামল বাংলায়। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুরণিত তাঁর অন্তর। দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাকে অনুপ্রাণিত করে। এদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে গড়ে তোলেন শিল্প প্রতিষ্ঠান। তিনি ওয়ান ব্যাংকের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরিচালক। ফাইন্যান্স লিজিং কোম্পানি ইউনিয়ন ক্যাপিটালের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরিচালক।

দেশের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মুক্তমনা প্রগতিশীল ভাবনার আবদুস সালাম শুরু করেন গণমানুষের জনপ্রিয় টি.ভি চ্যানেল 'একুশে টেলিভিশনের' পথ যাত্রা। তিনি এই জনপ্রিয় চ্যানেলে সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । বহু প্রতিবন্ধকতার পথ পেরিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নান্দনিকতা নিয়ে একুশে টেলিভিশন দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর অগ্রভাগে আবদুস সালামের অবদান অনস্বীকার্য। 'একুশে টেলিভিশন' এর সার্বিক বিষয় সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি 'একুশে টেলিভিশন', 'সাস ফ্যাশন ওয়ে আর লি., সেমি স্যাম ইন্টারন্যাশনাল লি., সারাহ কটন লি., সারাহ কোয়ালিটি প্রিন্ট লি. এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সাস হোল্ডিংস লি., সারাহ ট্রেডিং কোং লি., সাস সিকিউরিটিস লি., সাস এ্যাপারালস লি. এ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

এস.এম. আসলাম তালুকদার মান্না

বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক

এস.এম. আসলাম তালুকদার মান্না। পিতা এস.এম. নূরুল ইসলাম তালুকদার। তিনি ১ জানুয়ারি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল শহরের কলেজপাড়ায় বিখ্যাত তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার এলেঙ্গার পটলপাড়া। আরফান খান কোম্পানি এবং এস.এম. মুসা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁর দাদা এস.এম. মুসা তালুকদার। সেই সূত্রে তাঁর বাবাও ছিলেন ব্যবসায়ী। বিন্দুবাসিনী বয়েজ স্কুল থেকে এস.এস.সি, ভূঞাপুর ইবরাহীম খাঁ কলেজ হতে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মান্না স্নাতকে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাণিবিদ্যা নিয়ে। এরই মধ্যে জেলা পর্যায়ে স্কুল থেকে টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে যে কোনো খেলাধুলায় অধিনায়ক পদটা থাকতো মান্নার। কিন্তু খেলাধুলায় নয়, সৌখিন মান্নার লোভ ছিল ফ্যাশনেবল পোশাকের দিকে। সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছিল লিভাইস আর র‍্যাংলার ব্র্যান্ডের জিন্স। কানাডায় আত্মীয় থাকার সুবাদে পোষাকের শখ মেটাতে বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। পোষাকের পাশাপাশি ছিলেন গানের দারুণ ভক্ত। সবার ছোট হওয়াতে বড় ভাইবোনদের কাছ থেকে সালামি পেতেন উৎসবে-অনুষ্ঠানে। সেই সালামি থেকেই সাড়ে তিন হাজার টাকা জমিয়ে মান্না কিনে ফেলেছিলেন ন্যাশনাল প্যানাসনিক সেট। সেই সময়েই ঘরের দরজা বন্ধ করে মাইকেল জ্যাকসনের নাচ করতেন। বিপরীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোর কুমারের গানও ভালো লাগতো মান্নার। গ্রিনরোডে নিজেদের স্থায়ী বাড়ি থাকায় মান্না ঢাকা আসতেন প্রায়ই। শিল্পকলা একাডেমিতে যাতায়াতের সূত্রে জি.এ. মান্নান আর তাঁর মেয়ে নাগমার কাছে নাচটা শিখে নিতেন নিয়ম করে।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন নতুন মুখের সন্ধানে কার্যক্রম শুরু করলে বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহে রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে তাতে অংশ নেন মান্না। আর প্রথম প্রতিযোগিতাতেই প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার নৃত্যে পারদর্শী স্মার্ট যুবক মান্না বিচারকের দৃষ্টি কেড়ে নেন। সিলেকশন বোর্ডে বিচারক ছিলেন সুভাষ দত্ত, আমজাদ হোসেন, কাজী জহির, শিবলী সাদিক এবং খোদ নায়করাজ রাজ্জাক। যে রাজ্জাকের ছবি দেখে স্কুলে পড়ার সময় হাফপ্যান্ট পরে চলে আসতেন বলাকা হলে, সেই রাজ্জাকই বিচারকের ভূমিকায়। রাজ্জাকের অভিনীত একটি ছবির অংশ বিশেষ অভিনয় করে দেখিয়ে তিনি মুগ্ধ করলেন বিচারকদের। নির্বাচিত হলেন নতুন মুখের শিল্পী হিসেবে। সেই একই বছর মান্নার ব্যাচে ছিলেন সোহেল চৌধুরী, দিতি,

সুব্রত, শেলী কাদেরসহ আরো কয়েকজন। সেই সময়েই শেলীর প্রেমে পড়েন মান্না। পরবর্তীকালে মান্না-শেলী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নতুন মুখ নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্জাকের সুপারিশে আজহারুল ইসলাম পরিচালিত 'তওবা' ছবিতে মান্না পেলেন তৃতীয় নায়কের ছোট্ট পরিসরের চরিত্র। সেই ছবিতে প্রধান নায়ক ছিলেন রাজ্জাক নিজেই। নতুন মুখের শিল্পীদের নিয়ে এফডিসিতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিচালক কাজী হায়াৎ মান্নাকে কাছে ডাকলেন। নাম-ধাম জিজ্ঞেস করার পর অফার করলেন তাঁর 'পাগলী' ছবিতে অভিনয় করার জন্য। ছবিতে মান্না পেলেন তৃতীয় নায়কের চরিত্র। প্রধান নায়ক ছিলেন নতুন মুখের আরেক নায়ক সাত্তার। 'তওবা' মুক্তি পায় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। একই বছর কাজী হায়াতের 'পাগলী' ছবির মাধ্যমে দর্শকের কাছে প্রথম বড় ধরনের পরিচিতি লাভ করেন মান্না। কাজী হায়াতের একটানা বেশ কয়েকটি বক্তব্যধর্মী ছবিতে মান্না অভিনয় করেন। যন্ত্রণা, দাঙ্গা, ত্রাস, সিপাহী, দেশপ্রেমিক, দেশদ্রোহী এ রকম বেশ কয়েকটি ছবি প্রতিবাদী নায়ক হিসেবে দর্শকের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলে। আশি দশকের শেষের দিকে পরিচালক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, মনতাজুর রহমান আকবর, নাদিম মাহমুদ এমন সফল পরিচালকের ছবিতে নিয়মিত কাজ শুরু করলেন মান্না। প্রথম দিকে অধিকাংশ ছবিতেই সহনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন মান্না। সে সব ছবি হতো স্বল্প বাজেটে। কখনোই আলোচনায় আসতে পারতেন না। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে মোস্তফা আনোয়ারের 'কাশেম-মালার প্রেম' এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মনতাজুর রহমান আকবরের 'প্রেম দিওয়ানা' ব্লক মাস্টারের হিট হলে পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যেতে শুরু করে। চিত্রনায়িকা চম্পার সঙ্গে মান্নার বক্স অফিস সফল এক জুটি তৈরি হয়।

কিন্তু মধ্য আশি থেকে মধ্য নব্বই মান্নাকে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সাইনিং মানি নিয়ে কখনো জেনেছেন ছবি থেকে তিনি বাদ পড়েছেন। শুটিং স্পটে আবিষ্কার করেছেন তাঁর বদলে অভিনয় করছেন অন্য কেউ। অনেক নায়িকা বেঁকে বসেছেন তিনি ছবিতে আছেন জেনে। অসংখ্য ছবিতে মান্নাকে নির্মাতারা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেননি। পারিশ্রমিক নিয়েও মান্নাকে ভুগিয়েছেন বহু নির্মাতা। তাঁর বিরুদ্ধে নোংরা রাজনীতি করতেও অনেকে ছাড়েননি। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী মান্না ধৈর্য ধরে সকল বিপদ মোকাবেলা করে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়েছেন। অখ্যাত নির্মাতাদের ছবিতে কাজ করতে করতে সামনে এগিয়েছেন।

নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে মান্না অভিনীত 'রাজপথের রাজা, আন্দোলন, রুটি, বশিরা, এমন বেশ কিছু ছবি বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য পেলে বক্স অফিসে মান্নার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'লুটতরাজ' ছবির মাধ্যমে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মান্না। পরিচালক হিসেবে থাকেন কাজী হায়াত। আর এই ছবিতেই মান্নার ক্যারিয়ার ঘুরিয়ে দেয়। ছবিটি আকাশচুম্বী ব্যবসা করলে চলচ্চিত্রে গুঞ্জন শুরু হয়। তবে কি মান্নাই ঢাকার ছবির পরবর্তী সুপারস্টার? একনম্বর তারকা? এই প্রশ্নের জবাব মেলে মাত্র ছয় মাসের মাথায়। একসঙ্গে সুপার-স্টার হিট ব্যবসা করে কাজী হায়াত পরিচালিত 'তেজী', এবং মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত 'শান্ত কেন মাস্তান'। এরপর কেবলই মান্নার ছুটে চলা। মান্না অভিনীত একের পর এক ছবি ব্যবসায়িক

সাফল্য লাভ করে। চুরাশি থেকে আটানব্বই- এ দীর্ঘ সময়ে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল দেখা যায় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এ বছর মান্নার যেন নতুন জন্ম হয়। এ বছর চলচ্চিত্রে সবচেয়ে ক্ষমতাধর নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন মান্না। বিশেষ করে কাজী হায়াত পরিচালিত 'আম্মাজান' মান্নাকে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এনে দেয়। যে মান্না ছিলেন সাধারণ দর্শকের প্রিয় তারকা, সেই মান্নাই 'আম্মাজান'-এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত দর্শকদের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে যান। পরিণত হন ঢাকাই ছবির শীর্ষ নায়কে।

স্ত্রী বাংলাদেশ বিমানের কেবিন ক্রু শেলী কাদের, একমাত্র ছেলে সিয়াম ইলতিমাসকে নিয়ে ব্যক্তিজীবনে মান্না ছিলেন খুবই সুখী। মেরিনে ভর্তি হয়ে দেশ ভ্রমণের ঝোঁক থেকে যাওয়ায় স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে প্রায়ই তিনি বেরিয়ে পড়তেন দেশের বাইরে। দেশে শুটিং না থাকলে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতেন লং ড্রাইভে। কিন্তু পেশাদারী জীবনে স্ত্রী শেলী বিদেশ বিভূঁইয়ে বেশ ব্যস্ত ছিলেন। মান্নার অবসর মিলতো কদাচিৎ। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কাজ করতেন। কঠিন পরিশ্রম করতে পারতেন। প্রথম ছবির শুটিং-এর প্রথম দিন থেকেই কাজকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মান্না। শনিবার দুপুরেও একটি ছবির শুটিং করার কথা ছিল তাঁর চিরপ্রিয় এফডিসিতে। ছবির পরিচালক, নায়িকা, কলাকুশলিরা বসেছিলেন মান্নার অপেক্ষায়। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি জীবনের আপোষহীন লড়াকু মান্না তখনও পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। লড়তে লড়তে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। মৃত্যুর পরও তার মুখে ছিল এক চিলতে বিজয়ের হাসি। দর্শকের অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছিলেন মান্না। বাংলা চলচ্চিত্রে মান্না চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক মো. আবু মনছুর সাদি সালমান

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ক্রীড়া ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

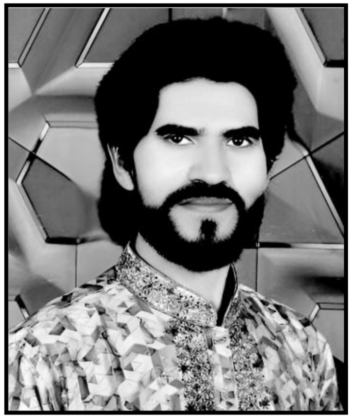

বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী যিনি, যার রয়েছে একাধিক পরিচয়, তিনি অধ্যাপক মো. আবু মনছুর সাদি সালমান। তিনি একাধারে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ক্রীড়া ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, বিতর্ক, আবৃত্তি, উপস্থাপনা ও বাকশিল্পী।

তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইল শহরস্থ বেড়াডোমায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. কেফাতুল্লাহ ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মাতা ছবুরন নেছা। ছয় ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠতম। পিতামাতার বড় আদরের সন্তান সাদি সালমান। পিতা-মাতা দুজনেই পরলোক গমন করেছেন। তার ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি যেমন প্রগাঢ় ভালোবাসা তেমনই সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার প্রতি রয়েছে প্রচণ্ড ঝোঁক।

শৈশবে বাসাখানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করে ২য় শ্রেণিতে ভর্তি হন বেড়াডোমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এখান থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বেড়াডোমা শহিদ জাহাঙ্গীর উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকেই এসএসসি পাস করেন। সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ কাগমারীতে ভর্তি হয়ে দুই বছর অধ্যয়নের পর ভর্তি হন কালিহাতী কলেজে এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর সরকারি সা'দত কলেজে স্নাতক ভর্তি হন এবং ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)-এ দর্শন বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানে কিছু দিন অধ্যয়নের পর ভর্তি হন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি টাঙ্গাইল হোমিও কলেজ হতে ডিএইচএমএস ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ল কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল ল কলেজ হতে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। এর মধ্যে তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ঢাকা এর অধীন ময়নামতি (সার্ভে) আমিন টেকনিক্যাল ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট হতে সার্ভেয়ার (আমিনশিপ) পাস করেন। তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপর পড়াশোনা করেন। টাঙ্গাইল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন করেন। টাঙ্গাইল শিল্পকলা একাডেমি থেকে অভিনয়, সঙ্গীত

এবং নৃত্যের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। আনন্দ একাডেমি ও ষড়জ পঞ্চম হতে সঙ্গীতের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অভিনয় ও সঙ্গীতের উপর দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা 'স্রোত' এবং 'আবৃত্তি একাডেমি' হতে আবৃত্তির উপর প্রশিক্ষণ নেন। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হিসেবে তিনি মার্শাল আর্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

তিনি অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, বিতর্ক, আবৃত্তি, উপস্থাপনা ও বাকশিল্পের উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিটিভিসহ বহুমঞ্চ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। ছায়ানীড় আয়োজিত বহু বাংলা বানান ও উচ্চারণ বিষয়ক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছেন। ছোটবেলায় নজরুল সেনা করতেন। কলেজ জীবনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর সাথে জড়িত থেকে ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। কালিহাতী কলেজে অধ্যয়নকালে বাগুটিয়া জমিদারের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে অবস্থান করেন। কলেজ জীবনে তিনি টাঙ্গাইলে উদীচী'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ডাকসু সাংস্কৃতিক দল, প্রচেষ্টা ও লোকনাট্যদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি এস.এম. হলের ভিপি প্রার্থী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল-এর অধীন রোভার ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সমাপণ করেন এবং রেড ক্রিসেন্ট-এর সাথে জড়িত আছেন। তিনি মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ডিগ্রি কলেজে দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এমএ অধ্যয়ন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট এর আজীবন সদস্য। তিনি বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বই পড়া, গান শোনা ও ভ্রমণ পছন্দ করেন।

উপস্থাপনা ও বাকশিল্পে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও অনলবর্ষী বক্তা। তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'দুঃস্বপ্ন' (ছায়ানীড় প্রকাশিত সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ)। তিনি ইসলামী বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং আধ্যাত্মিক চর্চা করেন।

তিনি 'পার্সনালিটি ডেভেলপমেন্ট' এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য পরিচর্যা হিসেবে তিনি যোগ ব্যায়াম ও মেডিটেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেন এবং আবৃত্তি ও বিতর্কের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। অভিনয় ও সঙ্গীতাঙ্গনে তিনি জনপ্রিয়। অধ্যাপক মো. আবু মনছুর সাদি সালমান শিক্ষার্থীদের মাঝে যেমন প্রিয় তেমনই সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত। তিনি সকল মানুষকেই ভালোবাসতে

চান, সকল মানুষেরই কাছে আসতে চান। তিনি মনে করেন সুশিক্ষিত সুশীল নাগরিক গড়ার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর উন্নয়ন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

পারিবারিক জীবনে তিনি এক কন্যা আনিকা তাসনিম রিশা ও একমাত্র পুত্র আদিব আল লাবিব এর সফল জনক।

পরিশেষে তার একটি কবিতার চরণ দিয়েই শেষ করা যাক

‘বিশ্ববুকে নিপুন হাতে
গড়বো মোরা এই দেশ
সারা বিশ্ব বলবে তখন
এইতো সাবাস বাংলাদেশ।’

তারানা হালিম

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাবেক প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ধ্রুব নক্ষত্র, নাট্য অভিনেতা, সুযোগ্য মানবাধিকার কর্মী, বলিষ্ঠ নারী নেত্রী, রাজনৈতিক অঙ্গনের সুপরিচিত মুখ তারানা হালিম। সরকারের অন্যতম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নীতি নির্ধারণ ও নীতিমালা বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের অবহেলিত অবস্থানকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে অতুলনীয় উন্নয়ন সাধন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন।

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার ধুবরিয়ার কৃতী সন্তান এডভোকেট তারানা হালিম। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল হলেও তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে ঢাকা শহরে। পিতা এম.এ হালিম ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। মাতা আকতার হালিম নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা ছিলেন। ১৬ আগস্ট ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তারানা হালিমের জন্ম ঢাকায়। পৈতৃকনিবাস নাগরপুরের ধুবরিয়া।

শৈশব থেকেই প্রতিভাদীপ্ত তারানা হালিম। মেধাবী ও চঞ্চল প্রকৃতির তারানা হালিম একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি অভিনয় ও ছবি আঁকার প্রতি দারুণ আগ্রহী ছিলেন। উদয়ন স্কুলে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় হতে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান লাভ করে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস.সি পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে সম্মানসহ এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ।

আইন পেশার মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লি.-এর উপদেষ্টা, ব্র্যাক-এ খণ্ডকালীন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১০ম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য মনোনীত হন। তিনি ডাক টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পরে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তারানা হালিম বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি- ১. বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক। ২. যুবলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ৩. ছাত্র জীবনে ছিলেন থিয়েটার কর্মী। ৪. মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা।

তিনি আমজাদ হোসেন পরিচালিত বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'গোলাপী এখন ট্রেনে' আলাপী চরিত্রে অভিনয় করে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

তিনি দু'সন্তানের জননী। বড় পুত্র- নাওয়ীদ আলী, নটিংহামে আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত এবং ছোট ছেলে সানবীমে অধ্যয়নরত।

পেশাগত প্রয়োজনে ও সৌখিন ভ্রমণে তিনি পৃথিবীর বহুদেশ গমন করেছেন। তন্মধ্যে চিন, কোরিয়া, ইংল্যান্ড, নরওয়ে, রাশিয়া, জেনেভা, ভিয়েতনাম, কাতার, সিঙ্গাপুর ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ।

তাঁর লিখিত 'তিন কন্যা' ও 'তিন অধ্যায়' নামক দু'টি উপন্যাস পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। এ ছাড়াও মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে এডভোকেট তারানা হালিম বলেন, ' জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে'।

ডিএ তায়েব

অভিনেতা

ডিএ তায়েব টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার কাটরা গ্রামে বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেওয়ান আব্দুল গনি এবং মাতা সুফিয়া কমলের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি আর কেউ নন বাংলাদেশের সর্বমহলের সবার ভালোবাসার প্রিয় মানুষ ডিএ তায়েব।

এই নক্ষত্রের পরিচয় তিনভাবে দেয়া যায়। প্রথমত, বাংলাদেশ পুলিশের গর্ব এক চৌকষ প্রথম শ্রেণির পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। দ্বিতীয়ত, মিডিয়া জগতের সবচেয়ে ভালো মানুষ। বাংলা চলচ্চিত্রের দুঃসময়ের দাপটে হিরো। তৃতীয়ত, তিনি মানবতার যুবরাজ।

বাংলাদেশের সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তির নাম ডি এ তায়েব। বহুদিন ধরে সততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, দৃঢ়তার সাথে পুলিশের গৌরবময় অফিসার হিসেবে ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে জাতিসংঘে বীরত্বের সাথে চাকরি করেছেন। তিনি জাতিসংঘের স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি চার বার মহা পুলিশ পরিদর্শক পদক লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি। মিডিয়াতে এমন শিল্পী খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তার বিপদে সবার প্রথম ডি এ তায়েব সেখানে উপস্থিত হননি। বাংলা চলচ্চিত্রের 'সোনাবন্ধু' খ্যাত এই সুপারস্টারের সহধর্মিণী বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রযোজক ও কাহিনিকার মাহবুবা শাহরিন। চলচ্চিত্রের এই দুঃসময়ে তিনি পর পর তিনটি দর্শকনন্দিত সিনেমা উপহার দিয়েছেন। সিনেমাপ্রেমীদের মাঝে কোটি ভক্তের হৃদয়ে স্থান দখল করে রেখেছেন তিনি। শুধু চলচ্চিত্রকে ভালোবাসার কারণে একটা শিল্পী মন থাকার কারণে এত কঠিন ব্যস্ততম সেবামূলক চাকরি করার পরেও- তিনি মিডিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। করোনা অতিমারিতে তার বহু সংগঠন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে (ডিএ তায়েব ফাউন্ডেশন 'ডিএ তায়েব ফ্রেন্ডস ক্লাব' সুপারস্টার ডিএ তায়েব অফিসিয়াল ফ্যান ক্লাব' সুপার হিরো ডিএ তায়েব ফ্যানক্লাব)। মানুষকে কীভাবে সম্মান করা যায়, একজন মানুষের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায় তার একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ডি এ তায়েব। তার মতো একজন মা ভক্ত ছেলে খুঁজে পাওয়া ভার।

বাংলাদেশি মিডিয়া টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের এক পরিচিত নাম ডিএ তায়েব 'প্যাকেজ' নাটকের শুরু থেকেই মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি নব্বই দশক থেকে আজও সমানতালে জনপ্রিয়। অনেকদিন ধরে তিনি দাপটের সাথে টেলিভিশন নাটকে রাজত্ব

করে আসছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের যখন দুঃসময় তখন শুধুমাত্র তার শিল্পমনা মন থাকাতে তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করেন এবং বাংলা চলচ্চিত্রের হাল ধরেন। তিনি টানা ৫ টি সিনেমা করেন এবং সমানতালে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মাত্র ৫ টি সিনেমায় অভিনয় করেও সুপারস্টার হওয়া যায় তার একমাত্র দৃষ্টান্ত ডিএ তায়েব। চলচ্চিত্রের ভাষায় একজন সুপারস্টার হলো যে নায়ক সবার ভালোবাসার প্রিয়, যাকে সব শ্রেণির দর্শক ভালোবাসে। অভিনয়ের এমন কোন চরিত্র নেই যে ডিএ তায়েব সেখানে অভিনয় করেননি। তিনি সব ধরনের অভিনয় করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে তার জাত চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার ভালোবাসা দিয়ে বর্তমানে মিডিয়া জগতের বাদশায় পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে অনেক সিনেমার কাজ তার হাতে রয়েছে। তার প্রাণবন্ত অভিনয় সব দর্শকের হৃদয় জুড়ে থাকে সব সময়। তিনি খুব সহজেই যেকোন চরিত্রকে মানিয়ে নিতে পারেন। বাংলাদেশি মিডিয়ায় তিনি রেকর্ড গড়া ১২৫+ নায়িকার বিপরীতে অভিনয় করেছেন। তিনি ২৫০০ এর বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন এবং তিনি 'সোনাবন্ধু', 'অন্ধকার জগত', 'আমার মা', 'ঈশা খাঁ' ও 'কাগজের বউ' এর মত জনপ্রিয় সিনেমাগুলোতে তিনি অভিনয় করেছেন। মিডিয়া টেলিভিশন ও বাংলা চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী কলাকুশলী পরিচালক প্রযোজক থেকে শুরু করে একজন প্রোডাকশন বয় পর্যন্ত তাকে মিডিয়া জগতের সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে সম্বোধন করে। তার একমাত্র অনুপ্রেরণা তার দর্শকরা। তিনি তার সকল দর্শককে তার অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তিনি নাটক এবং সিনেমাতে অনেক নায়িকা এবং সহ শিল্পীকে সহায়তা করেছেন। তারা আজকে দেশের নামকরা স্টার। মিডিয়াতে সবার আস্থাভাজন ডিএ তায়েব নাটক এবং সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি নিবেদিত প্রাণ। তিনি তার অভিনয় জীবনে বিভিন্ন নাটক সিনেমা ও টেলিফিল্মের জন্য দুই শতাধিক পুরস্কার লাভ করেন। তার অন্যতম পুরস্কারগুলো হলো হতাই নাটকের জন্য বাচসাস পুরস্কার। দর্শক রায়ে সেরা অভিনেতার পুরস্কার বিসিআর এ অ্যাওয়ার্ড। কবি বেগম সুফিয়া কামাল স্মৃতি পদক ২০০৮। এ ওয়ান টেলিমিডিয়া হৃদয় স্বাধীনতা অ্যাওয়ার্ড ২০১৯। শেরে বাংলা স্মৃতি সম্মাননা স্মারক ২০১৮। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সহ আরো অনেক পুরস্কার পান তিনি। তিনি বারী সিদ্দিকী স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। টাঙ্গাইল জেলা সমিতির ৭ বারের সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক। টেনাসিনাস বাংলাদেশ টেলিভিশন নাট্য শিল্পী সংঘের সম্মানিত সদস্য। উইক ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। পাকুল্লা অগ্রণী যুব সংঘের সাবেক সফল সভাপতি। তিনি ডিরেক্টর গিল্ডের সম্মানিত সদস্য। অভিনয় সংঘের সম্মানিত সদস্য। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সম্মানিত সদস্য ও বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাবের সম্মানিত আজীবন সদস্য।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের ইন্সপেক্টর পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

উত্তম চক্রবর্তী

বংশীবাদক

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরে উত্তম চক্রবর্তী ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্কুল শিক্ষক প্রয়াত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, মাতা ইন্দিরা চক্রবর্তী।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উত্তম চক্রবর্তীর বেড়ে ওঠা। পিতৃব্য ডা. ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণী শিল্পী। পিতৃব্য ভুবনেশ্বর ছিলেন লেখকের প্রেরণার উৎস। কিশোর বয়সেই বিকাশ ঘটেছিল বাদ্য-বাজনার আকাঙ্ক্ষা। কালক্রমে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উত্তম ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত নাট্যদল নাট্যকার মামুনুর রশীদের 'আরণ্যকের' সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তার দ্বৈত ভূমিকা ছিল অভিনেতা ও বাদন পরিচালকের। বর্তমানে প্রাচ্যনাটের সাথে জড়িত। বাঁশিতে যাদের কাছে আশীর্বাদ ধন্য তারা হলেন টাঙ্গাইলের সানোয়ার হোসেন, আব্দুল ওয়াহেদ (লিচু), ঢাকায় শৈলেন বাড়ৈ, আব্দুর রহমান, সুরকার দেবু ভট্টাচার্য, পান্নালাল ধরানার ব্যারিস্টার তৌফীক, বারী সিদ্দিকী। বর্তমানে তিনি ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের কাছে তালিম নিচ্ছেন। উত্তমের সফল ভূমিকার অভিব্যক্তি ঘটেছে অনেক একক অনুষ্ঠানে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, হোটেল শেরাটন উইন্টার গার্ডেন, রুশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট এবং বঙ্গভবন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৭-এ লস এঞ্জেলস নগরে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে সফল ভূমিকা রেখেছেন। উত্তম চক্রবর্তী ইতোমধ্যে ভারত ও মায়ানমারে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি একাধারে বংশীবাদক, লেখক, সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা।

তার রচিত উপন্যাস 'গুডবাই আমেরিকা, হারিয়ে পাওয়া, নতুন অধ্যায়, গল্পগ্রন্থ 'একটি রাত ও অন্যান্য গল্প' সিডর, গবেষণাধর্মী সঙ্গীত গ্রন্থ 'বাঁশির প্রথম পাঠ, কাব্যগ্রন্থ 'সুন্দরম, সারণী, ছোটদের নিয়ে লেখা সম্পাদনা গ্রন্থ- দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী, মানবসেবায় বরেণ্য ব্যক্তি পাঠক সমাদৃত হয়েছে। উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, শেকড়ের সন্ধানে দেশীয় যন্ত্র ও সংস্কৃতির বিকাশে মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে, নৈতিক অবক্ষয় রোধে, বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায়, বাঁশি শিল্পের উন্নয়নে সারা বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি 'দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নাট্য ও সঙ্গীতশিল্পী, স্ত্রী-লাবণ্য চক্রবর্তী ছেলে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী মেয়ে প্রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়েই তার বেটার ওয়ার্ল্ড।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

পরিচালক
উত্তম চিত্রকথা

নিরঞ্জন বিশ্বাস প্রগতিশীল চিন্তার মননশীল মানুষ। জন্ম টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলার কালিদাস ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। পিতা ডা. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, মাতা তারামণি বিশ্বাস। শৈশবে কালিদাসে লেখাপড়া শুরু। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নলুয়া বাছেদ খান উচ্চবিদ্যালয় হতে এসএসসি, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ, করটিয়া থেকে এইচএসসি এবং পরবর্তীকালে মির্জাপুর কলেজ হতে বিএ পাস করেন।

তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে জাফর আল মামুনের হাত ধরেই ফিল্মে আগমন করেন এবং আবিদ হাসান বাদল তার কাছেই মূলত দীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন পরিচালকের সাথে তিনি সহকারী হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে উত্তম চিত্রকথার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত প্রয়োজনে ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্যাংকক, প্রভৃতি দেশে গমন করেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে 'এরই নাম ভালবাসা' ছবির পরিচালক হিসেবে আত্মবিকাশ। দ্বিতীয় ছবি 'জীবন নিয়ে যুদ্ধ'। তৃতীয় ছবি 'রক্তচোষা'।

সুখময় সংসার জীবনে সহধর্মিণী ভুলন বিশ্বাস, দুইপুত্র সঞ্জয় বিশ্বাস নিরব, রাজ্যসুন্দর বিশ্বাস, (এই ছেলের নাম রাখেন প্রখ্যাত অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদী)।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যে দেশ ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সে দেশ তত বেশি উন্নত। আমাদের দেশে সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য অন্যতম মাধ্যম চলচ্চিত্র। তাই সুষ্ঠু ধারার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশকে উন্নত দেশে ত্বরান্বিত করতে চাই।'

মোহসিনা রহমান

প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সংবাদ পাঠিকা
একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)

জন্ম টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার সমেশপুর গ্রামে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট। পিতা খন্দকার আতাউর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা ও মাতা আনোয়ারা বেগম সুগৃহিণী। পিতামাতার সাত সন্তানের মাঝে তিনি পঞ্চম।

শৈশব কেটেছে নিজ গ্রামের শ্যামল ছায়ায়। প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি নন্দনপুর রাধারাণী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখায় এবং একই বিদ্যালয় হতে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ মুমিনুননেসা মহিলা কলেজ হতে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঢাকা আসেন।

শৈশবকাল থেকেই পিতার সাহিত্যচর্চা দেখে সাহিত্যের প্রতি তারও অনুরাগ সৃষ্টি হয়। পিতা যখন গভীর রাতে একলা আপনমনে কবিতা আবৃত্তি করতেন তখন তিনি তা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনতেন। পরবর্তীতে ছাত্রজীবনে তিনিও কবিতা আবৃত্তি, উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বপ্রস্তুতির সময় অনেক বড় মাপের সাংস্কৃতিক ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটেছে তার। সেই সময় বিটিভির মহাপরিচালক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজী আবু জাফর সিদ্দিকীসহ আশরাফুল আলম, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়ের মতো গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তারা সকলেই মোহসিনা রহমানের বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ শুনে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে, এই মেয়ে অবশ্যই একদিন সফলতা অর্জন করবে। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশ বেতারে সংবাদ পাঠের জন্য তার কাছে প্রস্তাব আসলেও তিনি সে সুযোগ গ্রহণ না করে বরং নিজেকে অধিক যোগ্য করে তৈরি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের ফাঁকে বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রে গিয়ে অন্যদের সংবাদ পাঠ শুনতেন এবং নিজে তা অনুশীলন করতেন। সেই সময় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদ পাঠিকা হিসেবে খ্যাত আসমা আহমেদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাকে সংবাদ পড়ে শোনাতেন। তার কাছে সংবাদ পাঠ অনুশীলনের সুযোগ পান।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ বেতারে সংবাদ পাঠিকা হিসেবে অডিশন দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে নির্বাচিত হন। খুব অল্প সময়েই তিনি প্রাইম বুলেটিন পাঠের সুযোগ পান। এরপর আর এক মুহূর্তও থেমে থাকেননি তিনি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি

বিটিভিতে সংবাদ পাঠিকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন এবং তিন মাস পরেই প্রাইম বুলেটিং পাঠের সুযোগ পান। সেই সময় থেকে পরপর কয়েকবার তিনি জাতীয় নির্বাচনের নির্বাচনী সংবাদ পাঠের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একুশে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম প্রডিউসার ও সংবাদ পাঠিকা হিসেবে যোগদান করেন। দুই বছর এই পদে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের পর তিনি প্রোগ্রাম ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি একুশে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সংবাদ পাঠিকা হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তার আয়োজনে একুশে টিভির বেশ কিছু জনপ্রিয় প্রোগ্রাম রয়েছে। তিনি দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি করেছেন প্রায় ১০০ পর্বের ডকুমেন্টারি প্রোগ্রাম 'অতঃপর আমি'। এছাড়া বীরাঙ্গনাদের নিয়ে ৭ পর্বের অনুষ্ঠান 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'সহ 'গানের ওপারে' এবং 'নারী নিরন্তর' তার আয়োজিত উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম। তিনি অনেক রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে উপস্থাপনা করেছেন। এছাড়াও তিনি জাতীয় গণমাধ্যমসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সংবাদ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

নুরুল আলম আতিক

চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচিত জনপদ টাঙ্গাইল। এই অঞ্চলে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি, যাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে স্থানীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছেন। সেই ধারার পদাঙ্ক অনুসরণ করা একজন নুরুল আলম আতিক তাঁদেরই প্রতিনিধি।

৩১ আগস্ট ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন আতিক। শিক্ষা জীবনের শুরু সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি তার আগ্রহ তাকে নিয়ে যায় ভারতের পুনেতে, যেখানে তিনি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের ফিল্ম-মেকিং কোর্স সম্পন্ন করেন।

আতিকের পেশাজীবন শুরু হয় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে জেনেসিস নামক একটি প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে। এরপর ১৯৯৯ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইস্টার্ন প্যানোরামায় মোশন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন। ২০০০ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জলছবি মুভি ফ্যাক্টরিতে লেখক ও পরিচালক ছিলেন। ২০০৫ থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মাছরাঙা প্রোডাকশন্সে প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর এবং লেখক হিসেবে কাজ করেন।

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন পাণ্ডুলিপি কারখানা। এই প্রোডাকশন হাউজ থেকেই তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। তার পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চতুর্থ মাত্রা, লাল মোরগের ঝুঁটি, এবং পেয়ারা সুবাস। লাল মোরগের ঝুঁটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ চারটি বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। পেয়ারা সুবাস ৪৫তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অফিসিয়াল সিলেকশনে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে মুক্তি পায়।

বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র আন্দোলনে আতিকের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, আতিক নিজেকে একজন চলচ্চিত্রকর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন প্রায়শই। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি উৎসবগুলোর জুরি সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন

ইনস্টিটিউট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র কর্মশালা পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

আতিকের ব্যক্তিজীবনও যেন এক সুরেলা গল্প। তার জীবনসঙ্গিনী মাতিয়া বানু শুকু শুধু তার সহধর্মিণী নন; তিনি তার সৃষ্টির সাথী। ব্যক্তিজীবনে আতিক এবং শুকু একসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন। শুকু একজন চিত্রনাট্যকার, সম্পাদক এবং নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। এই দম্পতির ঘরে তিন সন্তান। পাণ্ডুলিপি কারখানায় তারা একত্রে কাজ করে চলেছেন, নতুন গল্প বলার উপায় খুঁজে বের করছেন।

নুরুল আলম আতিক কেবল একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা নন; তিনি একজন লেখক ও কবি। তিনি লিখেছেন সম্পাদনা করেছেন অনেক বিষয় নিয়েই, তার সেসব লিখার পাঠক সংখ্যাও কম হবে না। আতিকের সিনেমা যেমন গল্প বলে এই দেশের চারপাশের, তার প্রতিটি শব্দ যেন জীবনকে নতুন করে তুলে আনে। টাঙ্গাইলের সেই আতিক আজ বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ নাম।

অমিত হাসান

নন্দিত চলচ্চিত্র অভিনেতা

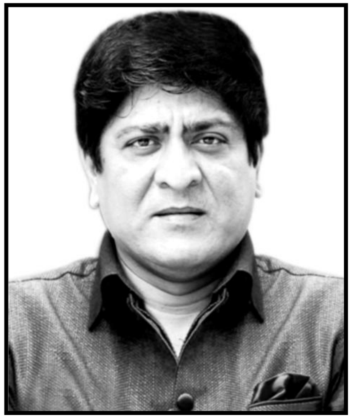

নানা বৈচিত্র্যের কারণে টাঙ্গাইলের সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। শিক্ষা সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতির দিক থেকেও টাঙ্গাইলের খ্যাতি সারা বাংলায়। টাঙ্গাইলকে বলা হয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নগরী। এই জেলায় যেমন পর্যটনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত তেমনি জন্মেছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি। যাঁরা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইলকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমনই একজন জননন্দিত গুণী অভিনেতা হলেন অমিত হাসান। যিনি চলচ্চিত্রের জননন্দিত নায়ক। পিতামাতার দেয়া নাম খন্দকার সাইফুর রহমান আজু। কলেজে পড়াকালীন তার এক বান্ধবী অমিত হাসান নাম দেন।

অমিত হাসান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর মির্জাপুর উপজেলার বানিয়ারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা খন্দকার সাইদুর রহমান (ম্যাথন)। তিনি ছিলেন জনতা ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার। তার পিতা স্কুল জীবনে ও পরবর্তীকালে টাঙ্গাইলের কৃতী ফুটবলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মাতা মোসাম্মৎ মালিহা রহমান।

তার দাদা এডভোকেট খন্দকার আজিজুর রহমান বিএ বিএল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কৃতী আইনজীবী ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল পৌরসভার প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান ছিলেন। দাদা তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যে সুযোগ্য আইনজীবী ও দয়ালু মানুষ হিসেবে গ্রামের গরীব মক্কেলদের কাছে প্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন। টাঙ্গাইলের আদালত পাড়ায় 'বানিয়ারা লজ' তার পৈতৃক বাড়ি।

অমিত হাসানের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় টাঙ্গাইল মডেল প্রাইমারি স্কুলে। এরপর বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক। সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, কাগমারী হতে উচ্চ মাধ্যমিক এবং সরকারি সা'দত কলেজ করটিয়া হতে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নুতন মুখের সন্ধানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ত হন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ছটকু আহমেদ পরিচালিত 'চেতনা' চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয়ের মাধ্যমে অভিষেক হয়। একক নায়ক হিসেবে তিনি প্রথম অভিনয় করেন মনোয়ার খোকনের 'জ্যোতি' চলচ্চিত্রে। এই দশকে তিনি শেষ ঠিকানা, জিদ্দী, বিদ্রোহী প্রেমিক, তুমি শুধু তুমি, বাবা কেন চাকর, রঙিন উজান ভাটি, ভালোবাসার ঘর চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

তিনি প্রায় ৬০০ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো তোমার জন্য পাগল, মেঘলা আকাশ, রংবাজ বাদশা, জামাই শ্বশুর, কঠিন সীমার, ভাইয়ের শত্রু ভাই, ডাক্তার বাড়ি, বউয়ের জ্বালা, বাদশা ভাই এলএলবি, তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা, সন্তান আমার অহংকার, অভিশপ্ত রাত, আইনের হাতে গ্রেফতার, চিরদিন আমি তোমার, ঠেকাও আন্দোলন, বাবা ঠাকুর, বিয়ে বাড়ি, ভণ্ড নায়ক, ভালোবাসা দিবি কিনা বল, প্রেম প্রেম পাগলামি, অন্যরকম ভালোবাসা, ফুল এন্ড ফাইনাল, তবুও ভালোবাসি, দাবাং, জিরো থেকে টপ হিরো, মনের মধ্যে লেখা, ফাঁদ, হিরো দ্যা সুপার স্টার, এইতো প্রেম, বোঝে না সে বোঝে না, অগ্নি-২, পদ্ম পাতার জল, মার্ডার-২, অন্তরঙ্গ, চিনিবিবি, অঙ্গার, রক্ত, শিকারি, বসগিরি, ধূমকেতু, রাজা ৪২০, ক্রাইম রোড, মায়াবিনী, সুলতানা বিবিয়ানা, নবাব, বস-২, রাজনীতি, রংবাজ, দুলাভাই জিন্দাবাদ, বয়ফ্রেন্ড, ডনগিরি, ক্রিমিনাল। অমিত হাসান ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রযোজকের খাতায় নাম লেখান এবং টেলিভিউ নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা চালু করেন। তার প্রথম প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'কে আপন কে পর' ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা থেকেই মুক্তি পায়। এতে তিনি নিজেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য আলমগীর ও ববিতা শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। তার আরও একটি প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'বিনি সুতার মালা'। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ভালোবাসার রঙ' ছবিতে প্রথমবারের মতো খল চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে তিনি 'তুফান' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে 'বাচসাস পুরস্কার' লাভ করেন। বাবা যাদব পরিচালিত 'বস-২' ছবিতে প্রথম তিনি কলকাতার অভিনেতা জিৎ-এর সাথে অভিনয় করেন। তিনি এ পর্যন্ত ১৫টির মতো বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনার ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি ছোট পর্দায় ২৫টির মতো নাটকেও অভিনয় করেছেন।

২০১৫-১৬ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সমিতির নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয় লাভ করে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। লায়ন্স ক্লাব অব ঢালিউড মুভির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি পেশাগত প্রয়োজনে ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

অমিত হাসান সিনেমা জগতে খুব সমাদৃত তার অভিনয় প্রতিভার জন্য। ব্যক্তিজীবনে লাবনী হাসান লাবণ্যর সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসারে দুই কন্যা। প্রথম কন্যা– লামিসা রহমান লামিসা এবং দ্বিতীয় কন্যা– নামিরা রহমান সামান্তা।

পাপিয়া সেলিম

সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, কলামিস্ট, সাংবাদিক ও প্রকাশক

উন্মুক্ত আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ যেমন ডানা ঝাপটিয়ে বেড়ায় তেমনি নৈসর্গিক লীলাভূমিতে মানুষও তার মুক্তচিন্তা আর চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু বাঙালি নারীর কী নিদারুণ পরিণতি, পুরুষ শাসিত সমাজ ও আইনের ধূম্রজালে আমাদের নারীরা যেন পরাধীন, বন্দী। নারীর অধিকার, মর্যাদা এখানে পদপিষ্ট।

উন্নত বিশ্বকে স্পর্শ করতে হলে নারী মুক্তি জরুরী। দৃশ্যত বাংলাদেশ এখন সেই পথেই এগুচ্ছে। কবি নজরুল বলেছেন–এ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি, চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে টাঙ্গাইলের তারকা শীর্ষক গ্রন্থটি যে কয়জন মানুষ জাতীয় অবদানে স্বীকৃত পাপিয়া সেলিম তাদের অন্যতম ছিলেন। বহুমাত্রিক প্রতিভায় বিকশিত পাপিয়া সেলিম মূলত একজন নাট্যকর্মী হিসেবেই চারদেয়ালের বাইরে আসেন। যিনি প্রথাগত নারী চরিত্রের বিরোধী। নারী শুধু সন্তান ধারণ আর পালনের জন্য নয়। বিত্ত বৈভব সৃষ্টি কল্পনায়, সৃজনশীল সামাজিক মর্যাদায় নারী অবশ্যই অংশীদার। পুরুষ শাসিতসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ফতুয়াবাজের বাংলাদেশ একজন নারীকে কতটা আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা, অকুতোভয় এবং বিদ্রোহী হতে হয় পাপিয়া সেলিম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পঙ্কিলতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রগতিশীল মুক্তমনা পাপিয়া সেলিম টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার হেমনগর ইউনিয়নের শিমলাপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত তালুকদার পরিবারে ০৭ জুলাই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা মিনহাজ তালুকদার সমাজসেবক এবং বাবা রাঙ্গা তালুকদার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। পাঁচ ভাই, এক বোনের পাপিয়া পারিবারিক পরিমণ্ডলে সবার আদরে বড় হলেও স্বভাবে দুরন্ত, ডানপিটে ছিলেন। মামাতো ভাই সেলিম তরফদারকে বিয়ে করে ২ ছেলে সন্তান পিমন- পিয়াসকে নিয়ে ভালই কাটছিল সংসার জীবন। এরই মধ্যে ১৯৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলমগীর খান মেনুর আহবানে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের বাৎসরিক নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' এবং 'নূরজাহান' স্থানীয় ভাসানী হলে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেই অভিনেত্রী হিসেবে সবার দৃষ্টিনন্দন প্রশংসায় সিক্ত হন। এ যেন লুকিয়ে থাকা প্রতিভা বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল মাত্র। তাইতো পাপিয়া সেলিমকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক সফলতায় সমৃদ্ধ করেছেন টাঙ্গাইল তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে। অভিনেত্রী পাপিয়া সেলিম ১৯৯৫

খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের সভানেত্রী হিসেবে সাংগঠনিক দায়িত্বে সফলভাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে অশুভ শক্তি কাজ করে। ফলে ভেঙ্গে যায় সাংগঠনিক একতা, থমকে যায় কাজের গতি। কিন্তু পাপিয়া সেলিম মাথা নোয়াবার নয়, অদম্য সাহস, আত্মবিশ্বাসী, সংস্কৃতির ঝাণ্ডাবাহী, সময়ের সাহসী পাপিয়া সেলিম 'টাঙ্গাইল থিয়েটার' নামে নতুন নাট্যদল গঠন করেন। মাতৃত্বের আদরে সংগঠনকে নিজ আবাসনে স্থান দিয়ে বাংলাদেশে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাই প্রখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতি সারা যাকের তার বাসায় গিয়ে নাট্যকর্মের বিভিন্ন উপকরণ দেখে যথার্থই বলেছিলেন, 'পাপিয়া তুমিই বাংলাদেশের একমাত্র নারী যে নাটকের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছো, তুমিই পারবে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে।' নাটককে ভালবেসে যিনি নাটকের মানুষদের আত্মার আত্মীয় মনে করেন, সংগঠনের সদস্যদেরকে সন্তান স্নেহে ভালবাসেন। টাঙ্গাইল থিয়েটারের কাণ্ডারী পাপিয়া সেলিম সার্থক সংগঠন হিসেবে টাঙ্গাইল থিয়েটারকে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য পর্যায়ে উন্নীত করেন। ফেডারেশন ভূক্তির মধ্য দিয়ে টাঙ্গাইল থিয়েটার সাংগঠনিক মর্যাদার জাতীয় স্বীকৃতি পায়।

সংগঠনের প্রতি নিরন্তর ভালবাসা, প্রতিটি সদস্যকে শাসনে সোহাগে উদ্দীপ্ত করা, প্রতিটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্মীকে একাকার করে নিয়েছেন। বিশাল ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল লড়াকু নাট্যকর্মী পাপিয়া সেলিমকে তাইতো সংগঠন 'টাঙ্গাইল থিয়েটারের জননী' খেতাবে ভূষিত করেছে। টাঙ্গাইল থিয়েটারের জননী খেতাবে ভূষিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের তৎকালীন সভাপতি সারা যাকের, সভাপতি লিয়াকত আলী লাকী, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কেরামত মওলা, সেক্রেটারি জেনারেল ঝুনা চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্য গবেষক ও কবি ড. আশরাফ সিদ্দিকী, যিনি পরবর্তীকালে পাপিয়া সেলিমকে শুধুই থিয়েটার মাতা হিসেবে সম্বোধন করেন।

অভিনেত্রী পাপিয়া টাঙ্গাইল থিয়েটারের নিজস্ব প্রযোজনার মঞ্চনাটক– বিয়ে হবে, ফুলকুমারী, মধুবালা, বেদের মেয়ে এবং বাঁকতলীর পরী নাটকে অনবদ্য অভিনয় করে সর্বজন প্রশংসা পেয়েছেন। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের নিয়মিত বাৎসরিক নাটকে অভিনয় করে তিনি সময়ের সেরা মঞ্চাভিনেত্রী প্রমাণ করেছেন। জাতীয় জাগরণে টাঙ্গাইলের নারী হিসেবে পাপিয়া সেলিম অপ্রতিদ্বন্দ্বী Unparalal ইতিহাস গড়েছেন। কারণ ইতোমধ্যে টাঙ্গাইলের কোনো নারী বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের পর পর তিনবার নির্বাচিত হননি তিনিই একমাত্র নারী যিনি ৩ বার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

মঞ্চনাটক পরিচালনায় পাপিয়া সেলিম টাঙ্গাইল থিয়েটারের– বিয়ে হবে, মধুমালা বাঁকতলীর পরী নাটকে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, বিটিভি এর তালিকাভূক্ত পাপিয়া সেলিম বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রায় ৭০-৮০টি নাটকে অভিনয় করেছেন। কৌতুহলী, আত্মবিশ্বাসী পাপিয়া সেলিম একান্তই সখের বশীভূত হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। তার প্রতিভা, সততা মুগ্ধ করেছে চলচ্চিত্র শিল্পের গুণী পরিচালকদের,

তাইতো অতিদ্রুত সময়ে ৩০-৪০টি ছবিতে কাজ করে সময়ের সেরা এবং নির্ভরযোগ্য পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবার প্রশংসা এবং ভালোবাসায় ধন্য হয়েছেন। তার মুক্তিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে- জগৎ সংসার, কঠিন প্রেম, এরই নাম ভালবাসা, বড় লোকের জামাই, ডাকু ফুলন, বকুল ফুলের মালাসহ আরও অনেক।

বহুমাত্রিক গুণান্বিত পাপিয়া রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোকিত মানুষ ছিলেন। টাঙ্গাইল জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদিকা হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করেন, গঠনমূলক এবং সুকণ্ঠি বক্তা হিসেবে, কর্মী ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দের আশির্বাদপুষ্ট ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ বাস্তুহারা লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য এবং টাঙ্গাইল জেলা বাস্তুহারা লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লড়াকু সৈনিক নির্ভীক পাপিয়া সেলিম প্রান্তিক কর্মী থেকে শুরু করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্নেহধন্য ছিলেন। বস্তুনিষ্ঠ সত্য উচ্চারণে পাপিয়া সেলিম বরাবরই আন্তরিক, নির্ভীক এবং আপোষহীন। তাইতো সাংবাদিকতার মসিতে লিখে যান অসিদের বিরোদ্ধাচারণ। তিনি একটি জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সাথে কলামিস্ট ও সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। মনের খেয়ালে যিনি মাঝে মধ্যেই লিখতেন। যদিও তার সরচিত কবিতা সাধারণ গ্রন্থাগার টাঙ্গাইল আয়োজিত স্বরচিত কবিতাপাঠ প্রতিযোগিতার আসরে শ্রেষ্ঠ কবিতা ও শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার হিসাবে পুরস্কৃত হয়। তিনি সাপ্তাহিক পাপিয়া নামে পত্রিকার প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশক ও সম্পাদক পাপিয়া কলামিস্ট ও সাংবাদিক পাপিয়া, অভিনেত্রী পাপিয়া, সংগঠক পাপিয়া, নাট্য পরিচালক পাপিয়া এবং রাজনীতিক পাপিয়া সমান্তরাল সফলতার পর রত্নগর্ভা মা হিসাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জনের ঠিক প্রারম্ভিক পর্যায়েই একটি মাত্র সড়ক দুর্ঘটনা সব তছনছ করে দিল। হ্যাঁ মাজহারুল ইসলাম পিমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলোয়াড়, যে ছেলেটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশের পক্ষে ৩ বার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বিশ্বের ৫টি দেশে লন টেনিস খেলতে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে গিয়েছে, যার বিশ্ব র‍্যাংকিং ছিল অনুর্ধ্ব ১৮ বৎসরে ২৫৬ গ্রাম। মাত্র ১৮ বছরের তেজোদীপ্ত উদীয়মান লন টেনিস তারকা, জাতীয় সম্পদকে হারিয়ে তিনি পাগল প্রায়। পাপিয়া সেলিম তার মেধা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি, প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং কঠিন চেষ্টার মুখে গড়েছিলেন পুত্রকে। প্রতিশ্রুতিশীল সন্তান মাকে বলেছিল, 'তোমাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এনে দেব। কিন্তু হায়!' দিকবিদিক অন্ধকার করে পিমন ০৫ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আশুলিয়ার টোল প্লাজার অদূরে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আনুমানিক সকাল ৮.৩০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি স্বরূপ ইতোমধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আহাদ আলী সরকার টাঙ্গাইল মাজহারুল ইসলাম পিমন স্মরণে একটি লন টেনিস গ্রাউন্ডের ফলক উন্মোচন করেছেন যেখানে হয়তো পিমনের মতো কৃতী খেলোয়াড় জন্ম নেবে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পাপিয়া সেলিম মৃত্যুবরণ করেন।

যাদুশিল্পী এস. এম. মানিক

পরিচালক, পি.সি. সরকার সাংস্কৃতিক পরিষদ, টাঙ্গাইল

যাদুশিল্পী এস. এম. মানিক টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলা সলিমাবাদ ইউনিয়নের মাইঝাইল গ্রামে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন ডানপিটে। লেখাপাড়ার প্রতি যতটা আগ্রহ ছিল তার থেকে বেশি আগ্রহ ছিল যাদুশিল্পের প্রতি। স্কুল ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন যাদুর অনুষ্ঠানে যেতেন এজন্য উচ্চশিক্ষা অর্জনে ব্যাঘাত ঘটে। পিতা: আব্দুর রহমান, মাতা: উজালা বেগম। তিনি পিতা-মাতার ছয় সন্তানের মধ্যে প্রথম। শৈশব কালেই তিনি পার্শ্ববর্তী বাজুয়ারটেক গ্রামে নানা ইয়ারচান শেখের বাড়ি থেকে তাদের আদর স্নেহে বড় হন। ছোটবেলা থেকে তিনি পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। পরিণত বয়সে কর্মজীবন হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। কিন্তু ছোটবেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যাদুশিল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন প্রবলভাবে। ফলে যাদুশিল্পকেই তার সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে ধরে রাখেন। তার এই অদম্য আগ্রহকে পূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশে আগত যাদুশিল্পী শংকর রায়ের নিকট থেকে যাদুবিদ্যার হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন যাদুশিল্পীর নিকট যাদুবিদ্যার তালিম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। শুরু হয় তার যাদু প্রদর্শনী। ক্রমেই তার যাদু প্রদর্শনীর আভা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। দেশের বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় অনুষ্ঠানে যাদু প্রদর্শন করে বিপুলভাবে সম্মানিত হন এবং সম্মাননা অর্জন করেন। এর মধ্যে অন্যতম ২৪-০৮-২০০৫ তারিখে জাতীয় যাদু উৎসবে ঢাকা শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চে তৎকালীন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমানের নিকট থেকে ক্রেস্ট, সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচা কচিকাঁচা মিলনায়তনে বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক ইয়াশা সোবহান ও কবি আসাদ চৌধুরীর নিকট থেকে ০৯-১২-২০১০ তারিখে সম্মাননা পদক গ্রহণ, ২৬-০৩-২০১৪ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন আয়োজিত টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের খোলা মাঠে একজন জ্যান্ত মানুষকে যাদুর মাধ্যমে উধাও করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। এই বিস্ময়কর যাদু দেখে জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান মিঞা আনন্দচিত্তে পুরস্কার প্রদান করেন। ১৪২১ বঙ্গাব্দ জেলা প্রশাসন আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে বৈশাখী মেলায় এক মেয়েকে তিন খণ্ড করেন এবং অলৌকিকভাবে চোখের পলকে দুই মেয়ে মঞ্চে উপস্থিত করে সারাদেশে আলোচিত হন। এই খবর নানান পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক আনিছুর রহমান মিঞা ও পৌর মেয়র সহিদুর রহমান খান মুক্তির নিকট থেকে পদক ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন। ১১-১১-২০১৪ তারিখে ন্যায্যকথা পত্রিকার তরফ

থেকে সাহিত্য প্রভা সম্মাননা গ্রহণ করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মহান বিজয় দিবসে টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাদু প্রদর্শনে একজন হানাদারকে লোক সম্মুখে উধাও করে ও দুই জন মুক্তিযোদ্ধাকে রক্তাক্ত অবস্থায় কয়েকটি বেলুন থেকে তৈরি করেন। শারীরিক কসরত প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আলহাজ মো. সানোয়ার হোসেন এমপি ও জেলা প্রশাসক মো. মাহবুব হোসেন-এর নিকট থেকে সম্মাননা ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২ মার্চ ২০১৫ তারিখে ন্যায্য কথা পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট যাদুশিল্পী হিসেবে গুণীজন সম্মাননা গ্রহণ করেন। ২৭ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে জাতীয় জাদু উৎসবে অংশগ্রহণ করে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কর্তৃক পদক ও সনদ লাভ করেন।

তিনি বিভিন্ন দিবসে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাদুর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এস.এম. মানিকের লালিত বাসনার লক্ষ্যে যাদুসম্রাট পি.সি. সরকারের নামে যাদু শিল্পকে চিরজাগ্রত রাখার প্রয়াসে পি.সি. সরকার সাংস্কৃতিক পরিষদ, টাঙ্গাইল নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন দাঁড় করেছেন। যাদুশিল্পী এস.এম. মানিক-এর নির্দেশনায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর সমন্বয়ে সারাদেশে নিপুণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছেন। তার শৈল্পিকগুণে মুগ্ধ হয়ে যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হন তার ছোট ভাই জহুরুল ইসলাম মিরাজ। বড় ভাই তাকে প্রধান সহযোগী হিসেবে পাশে রাখেন। তার অভিনব যাদু প্রদর্শন দর্শকমহলে বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীকালে জহুরুল ইসলাম মিরাজ নবপ্রজন্মে যাদুশিল্পের বিকাশ ঘটাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কান্দাপাচুরিয়ার মিজানুর রহমানের প্রথম কন্যা সালমা-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্রের জনক। বড় কন্যা মোছা. আরোবী, ছোট কন্যা মোছা. মরিয়ম আক্তার স্বপ্না, কনিষ্ঠ পুত্র মারুফ হোসেনকে নিয়ে সুখময় জীবনযাপন করছেন। টাঙ্গাইল পাঁচআনী বাজারে 'মারুফ অফসেট প্রিন্টিং' প্রেস নামে ছাপাখানার স্বত্ত্বাধিকারী।

শামসুজ্জামান দারু

সঙ্গীতশিল্পী, পরিচালক ও সংগঠক

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে টাঙ্গাইলের সঙ্গীতাঙ্গনে শামসুজ্জামান দারু একটি পরিচিত নাম। সে সময়ে সারাদেশে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে যে গতিশীলতা সৃষ্ট হয়, তা থেকে এই ক্ষুদে মফস্বল শহরটিও পিছিয়ে থাকেনি। সঙ্গীত ও মিউজিকের আঙ্গিক ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। বলাই বাহুল্য, এই নবতর ধারায় যে কয়জন তরুণ সঙ্গীত শিল্পী টাঙ্গাইলের সঙ্গীতাঙ্গনকে সজীব করে তোলেন শামসুজ্জামান দারু তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গত দেড় যুগ ধরে টাঙ্গাইলের সঙ্গীতাঙ্গনের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। টাঙ্গাইল শহরতো বটেই, জেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় অনুষ্ঠানাদিতে শামসুজ্জামান দারুর ব্যস্ত উপস্থিতি একজন নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীতশিল্পীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সঙ্গীতাঙ্গনে প্রবেশের কথা বলতে গিয়ে শামসুজ্জামান দারু বড় ভাই মনিরুজ্জামান সানুর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। বড়ভাই সঙ্গীতশিল্পী হতে চেয়েছিলেন, তার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ছোট ভাইয়ের মাধ্যমেই হয়তো সেই অপূর্ণ ইচ্ছার রূপায়ন দেখতে চেয়েছিলেন। তাই স্নেহে সহযোগিতায় তিনি শামসুজ্জামান দারুর প্রধান প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। বড় ভাই যখন মুক্তিযোদ্ধা, তখন তার সাথে দেখা করতে গিয়ে কাদের সিদ্দিকীর সাথে কিশোর দারুর দেখা হয়। সঙ্গীতানুরাগের কথা শুনে কাদের সিদ্দিকী তাকে ১০০/-টাকা দেন। পরবর্তীকালে সে টাকার সাথে আরো টাকা ভরে দারু প্রথম হারমোনিয়াম ক্রয় করেন। এই ঘটনাটি তার স্মৃতিতে সশ্রদ্ধ সতেজ।

ওস্তাদ বিমল রায়ের হাতে তার সঙ্গীতে প্রথম হাতেখড়ি। অতঃপর ওস্তাদ গোপাল দত্তের কাছে। সঙ্গীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনের জন্য দারু এসএসসি পাসের পর ঢাকায় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি নারায়ণ বসাক, আখতার সাদমানী, বারীন মজুমদার প্রমুখ সঙ্গীত প্রতিভার সান্নিধ্যে শিক্ষাগ্রহণ করেন। '৭৬ খ্রিস্টাব্দে এআই, মিউজ সমাপ্ত করে চট্টগ্রাম শাশ্বত ললিতকলা একাডেমিতে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে চলে আসেন টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলে দীর্ঘ অবস্থানের বিভিন্ন সময়ে তিনি করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সঙ্গীত বিদ্যালয়, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মির্জাপুর হোমস টাঙ্গাইল শিশু একাডেমিতে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থেকে শিশু-কিশোর সঙ্গীত শিল্পীদের গড়ায় এক প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত শিল্পকলা একাডেমির টাঙ্গাইল

শাখার শিল্পী পুলের প্রথম দলনেতা। তার নেতৃত্বে শিল্পীপুল ঢাকার শিল্পকলা একাডেমিতে কয়েকবার উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে লোকসঙ্গীত সম্মিলনে অংশগ্রহণসহ ময়মনসিংহ, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠান করে এই শিল্পীপুল জেলার সুনাম বয়ে আনেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত রোটারেক্ট ইন্টারন্যাশনালের কনফারেন্সে যোগদান তার প্রথম দেশের বাইরে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গমন।

শামসুজ্জামান দারু কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই প্রধানত পরিচিত। আধুনিক রোমান্টিক গানের পরিবেশনা তার ভালো। দেশাত্মবোধক, গণসঙ্গীত পরিবেশনা তার অনবদ্য। অবশ্য শেষোক্ত দুটি মাধ্যমে গাইতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তার কণ্ঠে গণসঙ্গীত বিশেষত- ভূপেন হাজারিকার গান পরিবেশনা মনে রাখার মতো। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে পরিচিতের বাইরে সঙ্গীত ও মিউজিকের প্রয়োজন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শামসুজ্জামান দারু দক্ষতা সম্পর্কে যারা জানেন তারা এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন তার আসল পরিচয়টা এখানেই। সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং সঙ্গীত ও মিউজিকের সাথে সম্পর্কিত নাটক, গীতি নৃত্যনাট্য, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে এ শহরের মুষ্টিমেয় যে প্রতিভাগুলো জড়িত তারা এই সত্যটা স্বীকার করবেন যে, এ সমস্ত জায়গায় শামসুজ্জামান দারু কখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী– অপরিহার্য। যে অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও মিউজিক একটা অংশ সে অংশটুকুর জন্য দারু অত্যন্ত নির্ভরশীল। তার 'সিনস্যারিটি' স্থিরতা ও স্মৃতিশক্তি তার সম্পদ।

'মফস্বল' নাট্য সম্প্রদায়, টাঙ্গাইলে একটি প্রগতিশীল নাট্য সংগঠন। এ যাবৎ মফস্বল নাট্য সম্প্রদায় যে কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন করেছে সে সব নাটকে গান ও মিউজিকের যে বিরাট অংশ ছিলো, সেক্ষেত্রে শামসুজ্জামান দারু তার দক্ষতা দিয়ে তার অপরিহার্যতাকেই প্রমাণ করেছেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার স্মরণে একক সঙ্গীতসন্ধ্যা ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর। টাঙ্গাইল ক্লাবের শতবর্ষের সমাপণী অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত সন্ধ্যা ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ বর্তমানে এসএসএস একটি এনজিওতে সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

প্রায় ১৭০টি অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনা করেন শামসুজ্জামান দারু। তন্মধ্যে গীতি নৃত্যনাট্য 'পঞ্চ সোনার চর', 'নলীন গাঁ' গীত আলেখ্য বিদ্রোহী, নাটক 'ইবলিশ', 'ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইঙ্গিত কুমারখালির চর, 'বাঁকতলীর পরী, এলেকশান ক্যারিক্যাচার উল্লেখযোগ্য। তার সুরারোপিত গানের সংখ্যা ২০০এর অধিক। নিজের লেখা গান সুর করেছেন প্রায় ৫০/৬০টি। তাছাড়া গোলাম আম্বিয়া নূরী, সুবিনয় দাস, ফাতেমা রহমান বিনু, মনিরুজ্জামান সানু, মাহবুব সাদিক ও শফিক ইমতিয়াজের শতাধিক গানে সুর সৃষ্টি করে সুরকার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তার সুরারোপিত ফোক, গণসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান মানগত দিক থেকে উন্নত ও ভিন্ন স্বাদের। দেশে তার প্রিয় কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার মাহমুদুন্নবী ও শাহনাজ রহমতউল্লাহ। দেশের বাইরে রফি, মানবেন্দ্র ও লতা।

ব্যক্তিগত জীবনে সৎ অনাড়ম্বর এই শিল্পী সঙ্গীতকে আনন্দের খোরাক হিসেবেই প্রধানত নিয়েছেন। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এমনকি জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নেও এ মাধ্যমকে ব্যবহারের ব্যাপারে তার প্রবল আপত্তি। সঙ্গীত মাধ্যম সম্পর্কে এই ধারণা এবং তার স্বভাবের অন্তর্মুখীতার কারণে অন্যদের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম তিনি।

টাঙ্গাইলের বর্তমান সাংস্কৃতিক, সঙ্গীতাঙ্গন সম্পর্কে শামসুজ্জামান দারু বেশ হতাশ। তার মতে এখানে সঙ্গীতের চর্চা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা কমে গেছে। প্রতিভা বিকাশে ভালো সংগঠনও নেই। তবে টাঙ্গাইলের সঙ্গীত অঙ্গনে অবদানের কথা বলতে গিয়ে তিনি যাদের নাম মনে করেন তাদের মধ্যে ওস্তাদ চান মোহন দাস, রতন ঠাকুর, অপরেশ চক্রবর্তী ও ছানোয়ার হেসেন অন্যতম।

জাফর আল মামুন

চলচ্চিত্র ও নাট্য পরিচালক

জাফর আল মামুন অনন্য আলোকিত মানুষ। বাংলাদেশের অন্যতম মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সখিপুর উপজেলার সকলের সুপ্রিয় মুখ। তাঁর জন্ম ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর সখিপুর বেড়বাড়ি পৈতৃক নিবাসে। পিতা আব্দুল খালেক মিয়া সচ্ছল গৃহস্থ। মাতা ফুল খাতুন। পিতা-মাতার চার সন্তানের মধ্যে জাফর আল মামুন জ্যেষ্ঠ। মিরিকপুর গঙ্গাচরণ তফসিলি উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাস করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালীন অভিনয়ে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এ জন্য শিক্ষকদের নিকট জাফর আল মামুন ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

খালা-খালুর ঢাকার বাসায় বেড়াতে এসে তিনি মিডিয়ায় প্রবেশের সুযোগ পান। খালু শমেজউদ্দীনের অবদান এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

স্কুলে অধ্যয়নকালীন এফডিসিতে চাষী নজরুলের 'বেহুলা লক্ষীন্দর' চলচ্চিত্রের শুটিং দর্শনকালে অনুপ্রাণিত হন। এই পরিবেশ তাকে দারুণ আকৃষ্ট করে। তিনি এ সময় সিদ্ধান্ত নেন ভালো ফিল্ম ডিরেক্টর হবার। রেডিওর সহকারী প্রযোজক হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু। 'অন্বেষা' ও যুবতরঙ্গ অনুষ্ঠান প্রযোজনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। এ সময় আবৃত্তি ও মঞ্চনাটকেও তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচালক বুলবুল আহমেদ-এর হাত ধরেই চলচ্চিত্রে পদচারণা। 'গরম হাওয়া' চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে মিডিয়ায় কাজ করার ব্যাপক সুযোগ ঘটে। প্রায় পঁচিশ বছর মিডিয়ায় তিনি পথ চলছেন দৃঢ়ভাবে। সহকারী পরিচালক ও প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রায় পঞ্চাশটির বেশী চলচ্চিত্রে তিনি কাজ করেন।

ট্রাস্ট মিডিয়া নামে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম পরিচালক। তাঁর লেখা ও নির্দেশনায় টিভি নাটকের সংখ্যা চার শতাধিক প্রচারিত হয়েছে।

সহধর্মিণী মরিয়ম পারভীন তাঁর সৃজনশীল প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করেন। সুখময় সংসার জীবনে কন্যা মৌ এবং পুত্র জারিফ।

বিদেশ ভ্রমণ: পেশাগত প্রয়োজনেই তিনি ভারত ও থাইল্যান্ড গমন করেছেন।

সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন বহু সম্মাননা। সফল পরিচালক হিসেবে সখিপুরবাসীও তাঁকে সম্মাননা স্মারক অর্পণ করেছেন।

'প্রেমের বাধা' 'শেষ চিঠি' ও একপশলা বৃষ্টি চলচ্চিত্র তিনটি পরিচালক হিসেবে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

ড. পদ্মিনী রায় (রূপালী)

সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

টাঙ্গাইল জেলায় জন্ম হয়েছে বহু কীর্তিমান ব্যক্তির। যারা যুগ যুগ ধরে দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের উন্নয়নে কিংবা দেশের বাইরে থেকে সুনাম কুড়িয়ে এনেছেন। আবার কেউ গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে উদ্ভাবন করছেন নতুন কিছু। ড. পদ্মিনী রায় (রূপালী) তাদের মধ্যে একজন। তার জন্ম ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার প্যারাডাইস পাড়ায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে। পিতা তারা পদ দে এডভোকেট ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক জগতেও তার বিচরণ ছিলো। মাতা মমতা দে। চার ভাই বোনের মাঝে তিনি জ্যেষ্ঠ। ভাই ড. পিনাকী দে, ড. শিবাজী দে এবং বোন ইন্দ্রানী সরকার (জোনাকী)। ড. পদ্মিনী রায় বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক পাস করেন। কুমুদিনী সরকারি কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। কলকাতার স্বনামধন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হতে সঙ্গীত বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। অতপর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হতে সঙ্গীত বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

তিনি অসিত রায়ের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অসিত রায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাদের সুখময় সংসারে দুই সন্তান। আয়ুষ রায় ও আর্য রায়।

মাহবুবা শাহরীন

নাট্যকার, প্রযোজক

মাহবুবা শাহরীন। জন্ম ঢাকায়। বাবা মকবুল হোসেন, মা রাজিয়া বেগম। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লেখিকা প্রথম। তিনি তেজগাঁও মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তাঁর লেখালেখির শুরু স্কুল জীবন থেকেই।

একজন দক্ষ ও গুণী নাট্যকারের হিসেবে মিডিয়ায় তার পরিচিতি রয়েছে। একযুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি নাটক টেলিফিল্মের স্ক্রিপ্ট রচনা করেছেন। তার রচিত নাটক ও টেলিফিল্ম দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। নাট্যাঙ্গনের পাশাপাশি তিনি সিনেমার স্ক্রিপ্টও লিখেছেন। তার কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্যে মুক্তি পেয়েছে 'সোনাবন্ধু' নামে একটি দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র।

তিনি অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে এস জি প্রোডাকশন নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে লেখিকা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্য নিজের রচিত নাটক নির্মাণ করেছেন। যা বিভিন্ন সময় প্রচারিত হয়েছে। নাটকগুলোর মধ্যে– তখন মোবাইল ছিল না, নায়িকার মা, চার বিবিই চমৎকার, বিষের জাল, মাইঠাল, অখণ্ড ভালোবাসা, ডাউট, ধন্যবাদ, সূর্যজ্বালা, উত্তেজিত শ্বশুর আব্বা উল্লেখযোগ্য। তবে বই আকারে প্রকাশিত 'আমাদের টুনটুনি' গল্পটি তাঁর প্রথম প্রয়াস। বর্তমানে লেখিকা মাহবুবা শাহরীন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এস জি প্রোডাকশনের চেয়ারম্যান এবং টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রডিউসারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের আইন বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি অসহায় শিল্পীদের সহায়তার লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ শিল্পী ঐক্যজোট এর অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। গল্পের ক্ষেত্রে মাহবুবা শাহরীনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। আরো ভালো গল্প উপহার পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে।

পারিবারিক জীবনে তিনি জনপ্রিয় টিভি তারকা ডিএ তায়েবের সাথে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সুখময় সংসার জীবনে রয়েছে এক পুত্র, এক কন্যা। পুত্র ইরতিয়াজ তায়েব আফি এবং কন্যা দেওয়ানজাদী তাজরেমিন তানহা টুনটুনি। তিনি ঘর সংসার সামাল দিয়ে স্বামীর নাট্যচর্চায় উদারভাবে সহযোগিতা করে আসছেন।

ছন্দা চক্রবর্তী
নজরুল সঙ্গীতশিল্পী

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মিষ্টভাষী ছন্দা চক্রবর্তী, সঙ্গীত সাধনা তার জীবনের ব্রত। পিতা মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, মাতা জয়ন্তী চক্রবর্তী সুগৃহিণী। ছন্দা চক্রাবর্তী পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। বড় বোন মীরা চক্রবর্তী ও সীমা চক্রবর্তীর গানের প্রতি ঝোঁক ছিল।

ছন্দা শৈশবে চমৎকার সাংস্কৃতিক বলয়ে মানুষ হন। মা-বাবা বোনের উৎসাহ উদ্দীপনা তাকে সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। জন্ম ২২ নভেম্বর ১৯৭৮, শৈশব কাটে টাঙ্গাইল শহরে। বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কুমুদিনী কলেজ হতে প্রথম বিভাগে এইচএসসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে সম্মানসহ এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন ২০০২ খ্রিস্টাব্দে।

২০০২ খ্রিস্টাব্দ শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী প্রভাষ চন্দ্র ভট্টাচার্য বিটিসিএল এর প্রকৌশলী, প্রান্তিকা ভট্টাচার্য তাদের একমাত্র সন্তান।

টাঙ্গাইলের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিক্ষক নিবেদিতা মণ্ডলের হাতেই সঙ্গীত সাধনা শুরু। মিউজিকে রতন অধিকারী তার পরমগুরু, সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনে তিনি বহু সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার লাভ করেন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ নজরুল, পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক গান প্রথম ও ২য় পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নয়টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নজরুল একাডেমি সম্মাননা লাভ করেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নজরুল সমাজ পদক এবং ২০১২ তে ছায়ানীড় গুণীজন সম্মাননা লাভ করেন।

তার প্রকাশিত অ্যালবাম 'দেশ ও মানুষের গান, প্রথম মনের মুকুল, যাহা কিছু মমো; সুবীর নন্দীর সাথে প্রকাশিত 'মোরা ছিনু একেলা', পরবর্তীকালে ভারত থেকে প্রকাশ পায় 'স্মৃতির বাগিচায়', একুশ থেকে বিজয় এবং ভীরু এ মনের কলি জনপ্রিয়তা।

রেডিও টেলিভিশনে বিশেষ গ্রেডপ্রাপ্ত হয়েছেন।

'নজরুলের গানে স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব'- এই শিরোনামে ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী তার এম.ফিল গাইড ছিলেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, স্বরলিপিকার সুধীন দাসের কাছে সুদীর্ঘ আট বছর যাবত দীক্ষা নিয়ে আসছেন।

সাক্ষাৎকারে ছন্দা চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিভাদীপ্ত নজরুলের গানগুলো শুদ্ধ অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমার ব্রত।'

লুৎফর হাসান
কণ্ঠশিল্পী ও লেখক

স্বমহিমায় উদ্ভাসিত টাঙ্গাইল জেলা। ইতিহাস ঐতিহ্যের নানা দিক বহন করে টাঙ্গাইল। বারোটি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত টাঙ্গাইল। একেকটি উপজেলা এক এক রকম বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তেমনি একটি উপজেলা গোপালপুর। অন্যান্য উপজেলার ন্যায় গোপালপুরের রয়েছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আর এই উপজেলার কৃতী মানুষদের অবদান উপজেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও সংস্কৃতির উৎকর্ষে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হেমচন্দ্র চৌধুরী, কৃষকনেতা হাতেম আলী খান, কায়সার আহেমদ মুন্সী, হাতেম আলী তালুকদার। বর্তমান প্রজন্মের বাহক হিসেবে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইল জেলাকে প্রতিনিধিত্ব করছেন যিনি তিনি হলেন লুৎফর হাসান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়মিত গান গাইতেন। তার গান কথানির্ভর। নব্বই দশকের সঞ্জীব চৌধুরী ও নগরবাউল জেমসকেই আদর্শ হিসেবে মানেন। গীতিকার, সঙ্গীতশিল্পী, কথা সাহিত্যিক সব মিলিয়ে একজন পরিপূর্ণ শিল্পী লুৎফর হাসান।

এক ফাঁকে জীবনের ঘিঞ্জিতে ঝলমল করে গানের রোদ উঠে গেছে। গেয়েছেন ঘুড়ি তুমি কার আকাশে উড়ো, ভাবনায় ডুবি ভাসি, যদি কান্না কান্না লাগে এবং আরও প্রায় দুই শতাধিক গান। লিখেছেন ও সুর করেছেন অর্ধ-সহস্রাধিক গান। 'ঘুড়ি তুমি কার আকাশে উড়ো' শ্রোতামহলে বেশ প্রশংসিত হয়। সেই থেকে গানের ঘুড়ি উড়ছে সঙ্গীতাঙ্গনে। যার নাটাই লুৎফর হাসানের হাতেই। তার গানের কথার মধ্যে এক ধরনের মায়াবী আচ্ছন্নতা আছে। শুধু গান লিখে বা গেয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তা কিন্তু নয়। পাশাপাশি গানের সুরও করেন নিপুণ হাতে। একক অ্যালবাম বের হয়েছে ৬টি। মিশ্র ১৫টি।

মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর টেলিভিশন সিনেমায় আইয়ুব বাচ্চুর সুরে 'ভাবনার রেলগাড়ি' শিরোনামের গানে কণ্ঠ দেন।

মূল পরিচয় গানে। তবু স্বাচ্ছন্দ্য পান লিখতেই। লেখালেখিই ছিলো প্রথম। গায়ক লুৎফর হাসানের পরিচিতি বেশি হলেও ঔপন্যাসিক হিসেবেও সুনাম রয়েছে তার। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখছেন অনেক শাখাতেই। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩১টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– ইন হাউস প্রোডাকশন, সগৌরবে চলিতেছে, ঘাসফুল ও সন্ধ্যামালতীরা, ঠিকানা রাত্রিপুর, নীল মলাটের গল্প, ডাক বাক্সের ডানা, তোমার

খোলা পিঠে আমার আততায়ী মেঘ, সুতো ছাড়া সংসার, ভালোবাসার উনুন ঘর, আয়না ভাঙা রোদ, ঝিনাই পাখি, ফেকুয়া, মানিব্যাগ, যে বছর তুমি আমি চাঁদে গিয়েছিলাম, লাল কাথানের দুঃখ, বগী নম্বর বর্গীয় জ, হেলেঞ্চাবতী, আগুন ভরা কলস, দুপুর পাখি ও মরাতাই। গান ও লেখালেখির পাশাপাশি আবৃত্তির আঙ্গিনায়ও সফল বিচরণ করছেন সমানতালে।

লুৎফর হাসানের জন্ম ঝিনাই নদীর ধারে নবগ্রামে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঘুরে ফিরে তার নানান লেখায় এই গ্রাম আর নদীই শাসন করে যায়। পিতা আব্দুর রহমান ও মাতা লতিফা বেগম। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়।

শৈশবে লেখাপড়া শুরু ঘাটাইলের পাকুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গোপালপুরের নবগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা, এরপর গোপালপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং আলিম পাস করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ-এ অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই চত্বর তাকে পাখি হতে শিখিয়েছিলো। সেই থেকে উড়ালপনা।

গান এবং লেখালেখির পাশাপাশি বর্তমানে গানচিল মিউজিকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আফরান নিশো

মডেল এবং টেলিভিশন অভিনেতা

আফরান নিশো। পারিবারিক নাম আহম্মেদ ফজলে রাব্বি। তিনি ৮ ডিসেম্বর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে তিনি ৮০০টিরও অধিক টেলিভিশন নাটক, টেলিভিশন চলচ্চিত্র, ওয়েব ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন।

নিশোর বাবা আবদুল হামিদ মিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের সদস্য ও ভূঞাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ফুসফুসে ক্যানসারজনিত রোগে ভুগে ১ অক্টোবর ২০২০ মৃত্যুবরণ করেন। নিশোর এক ভাই ও এক বোন রয়েছে।

তিনি ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি. পাস করেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অমিতাভ রেজার বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করার মাধ্যমে শুরু হয় তার অভিনয় যাত্রা এবং আফজাল হোসেনের প্রতিষ্ঠান 'টকিজ' স্ক্রিন টেস্ট দেওয়ার জন্য ডাকা হয়। (২০০৩)। এরপরে আরো অনেক নির্মাতার সাথে নানারকম কাজ করেন তিনি। থাইল্যান্ডে গিয়ে ডাবল কোলা ব্র্যান্ডের জিনি জিনজার ফ্লেভারের একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে অংশ নেন তিনি। এরপরে গাজী শুভ্র, গোলাম হায়দার কিসলু, কিরন মেহেদী প্রমুখ খ্যাতনামা পরিচালকের পরিচালনায় তিনি বিজ্ঞাপনে অংশ নেন।

তিনি বাঁধন, আনিকা কবির শখ, নুসরাত ইমরোজ তিশা ও মেহজাবিন চৌধুরীসহ অনেক অভিনেত্রীর সাথে অভিনয় করেছেন।

গাজী রাকায়াতের পরিচালনায় ঘরছাড়া নাটকের মধ্য দিয়ে এ ভুবনে আসেন তিনি (২০০৬)। নিশো অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হলঃ অপেক্ষার ফটোগ্রাফি, আঁধার ও আলো , বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, চলো না বৃষ্টিতে ভিজি, কায়াকর, লোটাকম্বল, বিয়ে পাগল, সুখের অসুখ, সমুদ্রজল, কারো কোন নীতি নেই, প্রেমময় মৃর্নোময়, মানব জমিন, অচেনা মানুষ, সবুজ নক্ষত্র, রুমালি, রং বেরং, নো প্রবলেম, দুলছে পেন্ডুলাম, আমার বাড়ি তোমার বাড়ি, এক পলকে, স্বপ্নগুলো ইচ্ছেমত, ফুলপরি, নিরুপমা, দুস্কর সমিত্র আর সাদাকালো ফ্রেম, মেঘলা রোদ্র, মায়াজাল, আধারেই আলো, নীল রৌদ্রের ঘ্রাণ, প্রপোজ, ইডিয়ট, বিভ্রান্তি, ধন্যবাদ ভালবাসা, টার্ন ওভার, উত্তরাধিকার, নেক্সট জেনারেসন ডট, তবুও জীবন, হিমেল, গ্রন্থকার,

একটি লাল শাড়ী এবং, ট্রাম্প কার্ড, জোকার, ভালবাসার খাচা ফেরে, অসমাপ্ত ভালবাসা, নীল রঙ্গের গল্প, আমি দেবদাস হতে চাই, একহাজার টাকা, সম্বোধন তিন প্রকার, চোখের মধ্যে স্বপ্ন থাকর, দ্যা ম্যাট্রোপোসিস, লেটস ফ্লাই, অজস্র ভুল বা একটি পদ্ম ফুল, লোটা কম্বল, নীলার অপমৃত্যু, অভিনেতা, তিন নাম্বার হাত, টম এন্ড জ্যারি, গোল্লাছুট, একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমের গল্প, অগ্নিগিরি, না চাইলেই যারে পাওয়া যায়, ডে আউট, কাঠপোকা, স্বপ্নেই বসাবস, দৌরাত্ম্য, থ্রেটওয়ালা, জলফড়িং এর গান, আমার স্ত্রী আততায়ী, লাইফ এন্ড পিয়ানো, বিজলী, স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা, অপূর্বা, অপেক্ষার ফটোগ্রাফি, নিল চিরকুট এবং তুমি, ব্রেক আপ ব্রেক ডাউন, ট্রুথ আন্ড ডিয়ার, জীবন বদল, আউট অফ দ্যা ওয়াল্ড ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র: প্রায়শ্চিত্ত, নীল জলের কাব্য, সুড়ঙ্গ ইত্যাদি।

ওয়েব ধারাবাহিক: সাড়ে ষোল, সিন্ডিকেট, কাইজার, রেডরাম, মরীচিকা, মাইনকার চিপায় ইত্যাদি।

ধারাবাহিক নাটক: হাউজ নং ৯৬

পুরস্কার ও মনোনয়ন: মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার- সেরা টিভি অভিনেতা (সমালোচক) ২০১৭, সেরা টিভি অভিনেতা (দর্শক জরিপ) ২০১৮, সেরা টিভি অভিনেতা (সমালোচক)২০১৯, সেরা টিভি অভিনেতা (দর্শক জরিপ)২০২১, সেরা টিভি ও ডিজিটাল মাধ্যম অভিনেতা (দর্শক জরিপ)।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।

মো. রুহুল আমীন খোকন

সঙ্গীত শিল্পী

শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ টাঙ্গাইল জেলা। সংস্কৃতির নগরী হিসেবে পরিচিত এই জেলার মেধাবী সন্তানেরা তাদের মেধা মননের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুনাম কুড়াচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তারা আজ জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। আবার কেউ কেউ এ জেলায় জন্ম না নিলেও এখানকার উর্বর ভূমিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের পথ অনুসরণ করে চলছেন মো. রুহুল আমীন খোকন। তিনি জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার চর ভাটিয়ানী গ্রামে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ঘাটাইল উপজেলায় স্থায়িভাবে বসবাস করছেন। পিতা আব্দুল বারেক মুন্সী ব্যবসায়ী ছিলেন। মাতা মাজেদা বেগম গৃহিণী। পিতা-মাতার চার পুত্র দুই কন্যার মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। চরভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর সুজাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখানেই তার সঙ্গীত সাধনার যাত্রা শুরু। স্কুল কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি গান করতেন। সরিষাবাড়ি সাংস্কৃতিক সংসদ থেকে তার গানের হাতেখড়ি হয় ওস্তাদ শেখ শহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, হুমায়ুন স্যার, রঞ্জু আহমেদ ও শামসুদ্দিন স্যারের কাছ থেকে। সেই থেকে তার সুর আর থেমে নেই। তিনি মাছরাঙা, মোহনা, বিজয় টিভি, বাংলা টিভি, এশিয়ান টেলিভিশনসহ মঞ্চ প্রোগ্রামে জনপ্রিয়তার সাথে সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বেতার এবং বিটিভির তালিকাভুক্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী। বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি গান পরিবেশনের পাশাপাশি কি-বোর্ড বাজান। তিনি টাঙ্গাইল থিয়েটারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ মিউজিশিয়ানস ফাউন্ডেশন (BMF)-টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক। ক্লিন টাঙ্গাইল-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। তিনি বাউলিয়ানা শিল্পীগোষ্ঠী নামে একটি সঙ্গীত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি হেলেনা আক্তার মায়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সহধর্মিণী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাদের সুখময় সংসারে শোভাবর্ধন করেছে একমাত্র কন্যা মেহেনাজ। সে কুমুদিনী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেছে।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

অভিনেতা, নাট্যনির্মাতা এবং ব্যবসায়ী

ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ জেলা টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সেই থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইলের যে সকল গুণী ব্যক্তির সফল পদচারণা লক্ষণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম– নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, তারানা হালিম, খালেদ খান, শহীদুজ্জামান সেলিম, ডিএ তায়েব, জনপ্রিয় নায়ক প্রয়াত আসলাম তালুকদার মান্না, অমিত হাসানসহ অনেক গুণী অভিনেতা অভিনেত্রী। এরা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নিজের জন্মস্থান টাঙ্গাইলকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে টাঙ্গাইলের সমৃদ্ধি ঘটেছে। এছাড়া তারা অভিনয়ের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, কেউ হয়েছেন নির্মাতা, কেউ হয়েছেন পরিচালক, আবার কারও সফল পদচারণা রয়েছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তারা যেমন টাঙ্গাইলের একেকটি বিজ্ঞাপন, তেমনি বর্তমানে টাঙ্গাইলের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি অভিনয়ের মাধ্যমে সবার নজর কাড়ার পাশাপাশি সুনাম অর্জন করেছেন, তিনি সবার প্রিয় সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান।

সিদ্দিকুর রহমান নামটা শোনামাত্র শুধু বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের মুখে হাসি নয়, সারা বিশ্বেও বসবাসকারী বাংলা ভাষী মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠে ।

তরুণ নাট্য অভিনেতা মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার কুড়ালিয়া গ্রামে ১ জানুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। পিতা মো. মোজাফ্ফর আলী সফল ব্যবসায়ী এবং মাতা মোছাম্মৎ হামিদা বেগম সুগৃহিণী। বসবাস মধুপুর সদর থানায় বোয়ালী গ্রামে। পাঁচ ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে তার অবস্থান ৬ষ্ঠ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই সফল ব্যবসায়ী, বসবাস করেন ঢাকায় । আর দুই ভাই বসবাস করেন মধুপুর। তারাও পেশায় ব্যবসায়ী। মোট কথা ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান তিনি। জীবনে বেশি সময় পার করেন মধুপুরেই।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন মধুপুর শহীদস্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এখানে তিনি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর অতিরিক্ত চঞ্চলতার কারণে শহীদস্মৃতি থেকে টিসি পেয়ে চলে আসেন অজপাড়াগাঁয়ের চাপড়ি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখান থেকে জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তিনি । এরপর চাপড়ি গণ উচ্চ বিদ্যলয় হতে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাস করেন। তারপর

দেশের সেরা নটরডেম কলেজ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর তিনি পাড়ি জমাতে চান নিউজিল্যান্ডের এ আই এস স্টির্ট হোলেন্স ইউনির্ভাসিটিতে। সেখান থেকে প্রি-ভিসা পাওয়ার পর তার মন টানে না এই মায়ের দেশ ও সোনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার। অবশেষে জন্মস্থানের টানে থেকে যান। ভর্তি হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখান থেকে অর্থনীতিতে অনার্স মাস্টার্স পাস করে শিক্ষাজীবনের ইতি টানেন।

তারপর শুরু করেন তার মিডিয়ার জীবন, আজকে দেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা এবং নির্মাতা সিদ্দিকুর রহমান। তিনি মিডিয়ার উপর বাংলাদেশ নিমকো থেকে শর্ট কোর্স করেন । সেখান থেকে তিনি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সবার সেরা নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই নাট্যজগতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন সিদ্দিকুর রহমান। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক রচনা এবং নির্মাতা হিসেবে সফল হন। তিনি এ পর্যন্ত ৩৩টি নাটক রচনা, ১২টি নাটক পরিচালনা এবং প্রায় চারশত নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে পরিচিতি পেয়েছেন টাঙ্গাইল তথা দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে। তিনি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সেরা নাট্যকার হিসেবে মেরিল প্রথম আলো নমিনেশন লাভ করেন। ছাত্রজীবনে দুষ্টুমির জন্য নটরডেম কলেজ থেকে প্রায় টিসি পেতে গিয়েও পাননি। অভিনেতা হওয়ার পর তিনি বর্তমানে নটরডেম কলেজের আজীবন সদস্য।

তিনি শুধু তার কর্মজীবন নিয়েই ভাবেন না, পাশাপাশি ভাবেন তার জন্মস্থান মধুপুরকে নিয়ে। স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের মধ্যে মধুপুর হবে এমন একটা থানা যা দেখে সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠবে মডেল থানা। এই লক্ষ্যে তিনি সব সময় ছুটে চলে যান মধুপুরে।

সামাজিক অবদান: আরামবাগ থিয়েটারের সদস্য, নটরডেম কলেজ নাট্যদলের আজীবন সদস্য। মধুপুর-ধনবাড়ি যুব সমাজকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুলেছেন বিশটির মত সংঘ । যাদের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের পাশে থাকা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তাদের শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, খেলাধুলা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সকল প্রকার ভালো কাজে সহযোগিতা করা। এই লক্ষ্যে তিনি সামান্য হলেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সবসময়। সারা জীবন মানুষের পাশে থাকতে চান জনপ্রিয় অভিনেতা মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান।

রিয়াজুল রিজু

চলচ্চিত্র নির্মাতা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে যারা সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাদের মধ্যে একজন রিয়াজুল রিজু। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি টাঙ্গাইল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মডেল প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলে ভর্তি হলেও পরবর্তীকালে শিবনাথ হাই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেন। সরকারি এম এম আলী কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করেন, সরকারি সা'দত কলেজ থেকে দর্শনে সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও হোমিওপ্যাথিতে ডিএইচ এম এস ৪ বছরের ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন সম্মান পড়ার পাশাপাশি।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিভূতি ভট্টাচার্যর মাধ্যমে প্রথম মঞ্চ নাটক শুরু করেন। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল শহরের 'ত্রিবেণী' নামক সংগঠনে দীর্ঘ সময় পথ নাটক ও মঞ্চ নাটক করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে নির্মাতা ও অভিনেতা শাহেদ শরীফ খানের সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং উনাকেই ওস্তাদ মান্য করেন। পাশাপাশি তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা শেষে ২০১০ এ প্রথম নাট্য নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ২৬ পর্বের ধারাবাহিক নাটক 'ঘুম নেই' নির্মাণের মাধ্যমে। ২০১০ এ তিনি নিউজ এন্ড কারেন্ট এফেয়ার্স প্রডিউসার হিসেবে জয়েন করেন এসএ টিভিতে। সেখানে এন সি এ জনপ্রিয় প্রোগ্রাম 'চারপাশ', 'খোঁজ' সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার টেলিভিশনের ওস্তাদ ছিলেন তৌফিক শান্ত। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই চলচ্চিত্রের নির্বাহী প্রযোজক এম এ হোসেন মনজু ও তার চাচা ভাসটেক লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং পিএমএস বিডির মালিক আনোয়ার হোসেনের সহযোগিতায় 'বাপজানের বায়স্কোপ'। চলচ্চিত্রটি টরেন্টোসহ ৭৪ টি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করে এবং ৪০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে রিয়াজুল রিজু পরিচালিত 'বাপজানার বায়োস্কোপ' চলচ্চিত্রটি আটটি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। রিয়াজুল রিজু উপমহাদেশের সর্বকনিষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার হন। অভিনেতা হিসেবেও রিয়াজুল রিজু চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও এবং মঞ্চে কাজ করছেন নিয়মিত। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে তিনি বর্তমান সময় পর্যন্ত কাজ করছেন

বাংলাদেশ সরকারের ও বিভিন্ন কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি নির্মাণ। ২০২১ এ আবার এস টিভিতে এক বছর কাজ করেন নিউজ প্রডিউসার হিসেবে। ২০২২ এর শেষ থেকে ২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্লাটফর্ম আইসক্রিনে নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম 'কারুকাজ'। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

- ❑ সদস্য, বাংলাদেশ প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি।
- ❑ সদস্য, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি।
- ❑ সদস্য, টেলিপ্যাব (সাবেক নির্বাহী সদস্য)।
- ❑ ডিজিটাল হেড হিসেবে বাংলা ভয়েস অনলাইন পোর্টালে নাট্য নির্মাতাদের সংগঠন (সাবেক ডিরেক্টরস গিল্ডে আইন ও কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক)।

হোমিও চিকিৎসা করেন বাবা ডা. জি মওলার ৪০ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান মওলা হোমিও ক্লিনিকে। চিকিৎসক হিসেবেও রিয়াজুল রিজুর সুখ্যাতি রয়েছে টাঙ্গাইলে। রিয়াজুল রিজুর দাদা রহিজ উদ্দিন সরকার টাঙ্গাইল সদর থানার সুবর্ণতলী গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে সরকারি হয়ে যায় এবং সুবর্ণতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। তার বাবা ডা. জি মওলা টাঙ্গাইল শহরে টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। মা মনিয়া আক্তার ও স্ত্রী রিমা মওলা দুজনেই হোমিও চিকিৎসক এবং টাঙ্গাইলে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে ট্রাফিক মোড়ে তাদের চেম্বার। রিয়াজুল রিজুর সংসারে শোভা বর্ধন করেছে দুই সন্তান আহনাফ কুদরত পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ সরকার। ২০২৪ এর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধও হয়েছেন নির্মাতা রিয়াজুল রিজু। সাহসী ও প্রতিবাদী রিয়াজুল রিজুর অদম্য মনোবলই তার পাথেয়।

বেলাল খান

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক

ঐতিহ্যবাহী তাঁতের শাড়ি, পোড়াবাড়ির চমচম, মধুপুরের আনারস আর শালবন টাঙ্গাইল জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তবে টাঙ্গাইল জেলার পরিচিতি শুধু এই সকল বৈশিষ্ট্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সকল উন্নয়নমূলক কাজে টাঙ্গাইল জেলার গুণী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষণীয়। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন টাঙ্গাইলের কৃতী সন্তানেরা। ঠিক একইভাবে দেশের সংস্কৃতির বলয়েও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন টাঙ্গাইলের প্রতিভাদীপ্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ। টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের কথা আসতেই ওঠে আসে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, তারানা হালিম, খালেদ খান, শহীদুজ্জামান সেলিম, প্রিয়মুখ আসলাম তালুকদার মান্না, অমিত হাসান, ডিএ তায়েব, সিদ্দিকুর রহমানসহ অনেক গুণী অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম। ঠিক তেমনি যাদের পদচারণায় সঙ্গীতাঙ্গনও হয়েছে সমৃদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম লোকমান হোসেন ফকির, সুরকার আলম খান এবং পপ সম্রাট আজম খানের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে বর্তমানে সঙ্গীতের জগতে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন টাঙ্গাইলের তরুণ প্রতিভাদীপ্ত মেধাবী শিল্পী বেলাল খান। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ‘পাগল তোর জন্যেরে’ শিরোনামে গানটির সুরকার ও গায়ক হিসেবে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তিনি। তার সুর ও সঙ্গীতে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এই গানটি গেয়ে ন্যান্সি ‘মেরিল প্রথম আলো তারকা জরিপ’-এ শ্রেষ্ঠ গায়িকার পুরস্কার পান। এই একটি মাত্র গানের মাধ্যমেই অসংখ্য ভক্ত শ্রোতার হৃদয়ে স্থান দখল করে নিয়েছেন বেলাল খান। আর এই গানের মাধ্যমেই দেশে তথা দেশের বাইরে সঙ্গীতজগতে নিজের স্বতন্ত্র একটি জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। ‘পাগল তোর জন্যেরে’ গানের কথার মতই সুরের মুর্ছনা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। বেলাল খানের প্রথম একক এ্যালবাম ‘আলাপন’। এই এ্যালবামের ‘এক মুঠো স্বপ্ন’ এবং ‘ভালবাসি হয়নি বলা’ গান দু’টি শ্রোতামহলে দারুণ সাড়া জাগায়। সেই যে পথ চলার শুরু। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সূচনা যেমন, তেমনি পরের গানগুলোও পেয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এছাড়া সোনাপাখি, যতদিন ধরে বাঁচি, সামান্য সম্বল, শুনতে কি পাও গানগুলো উল্লেখযোগ্য। কেনরে চলে গাড়ি অচেনা স্টেশনে– এমন কথার ‘স্টেশন’ শিরোনামের গানটি মাসুদ পথিকের ‘নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ’ ছবির জন্য করা। এই গানটির প্রসঙ্গে বেলাল খান বলেন– ‘এটা আমার অন্যতম সেরা গান। গানটি আমার ক্যারিয়ারে ভিন্নমাত্রা যোগ

করেছে’। নেকাব্বরের মহাপ্রয়ান চলচ্চিত্রের মমতাজের গাওয়া গানটির জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬ এর শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই গানটির জন্যই কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত টেলি সিনে এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে থেকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। ‘হৃদয় জুড়ে’ সিনেমার ‘বিশ্বাস যদি যায়রে’ গানের জন্য বেলাল খান ‘শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক’ হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক এ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।

চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক করার মাধ্যমেই ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন বেলাল খান। ফলে চলচ্চিত্রের গানের সঙ্গে তার সম্পর্কটা একটু অন্যরকম। একক এবং দ্বৈতগানের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গানের কম্পোজিশন করছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে– অল্প অল্প প্রেমের গল্প, মুসাফির, প্রেমই খোদা- খোদাই প্রেম, আকাশ কত দূরে, খুঁটি, মার ছক্কা, ভুলা তো যায় না তারে, স্বপ্নপোকা।

বেলাল খানের জন্ম টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার নলুয়া গ্রামে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তালিকাভূক্ত হওয়া এই গুণী সন্তানের পিতা হাজী লুৎফর রহমান খান দীর্ঘদিন প্রবাসে জীবন যাপন শেষে বর্তমানে দেশে অবস্থানরত ও মাতা বেদেনা আক্তার আদর্শ গৃহিণী। পিতা-মাতার তিন সন্তানের মাঝে তিনি জ্যেষ্ঠ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সখিপুরে কাটিয়েছেন শৈশব-কৈশোর। প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি নলুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নলুয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে দাখিল এবং মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা হতে আলিম পাস করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতকে মনে লালন করলেও অনুকূল পরিবেশের অভাবে নিজেকে সঙ্গীত জগত থেকে দূরেই রেখেছেন জীবনের অনেকটা সময়। কিন্তু সঙ্গীত যার সত্ত্বার সাথে মিশে আছে তাকে কি সঙ্গীত থেকে দূরে রাখা সম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বেলাল খানের মনের জানালা খুলে যায়। সঙ্গীত জগতের গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন এই সময়েই। আর এই সময়টাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নিজের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই শুরু করেন নিয়মিত অধ্যবসায়। শিক্ষাজীবন শেষে যখন সবাই বিসিএস বা চাকরির পেছনে ছুটছেন, তিনি তখন ছুটেছেন সঙ্গীতের পেছনে। যার ফল আজকের কণ্ঠশিল্পী ও কম্পোজার বেলাল খান।

একে একে স্বপ্নের সিঁড়িগুলো ভেঙে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে দাঁড়াতে তার পাশে ছিলেন সহধর্মিণী মাহমুদা খানম। সেই সাথে আত্মীয় পরিজনদের উৎসাহে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন বেলাল খান।

প্রথম এ্যালবাম মুক্তি পাওয়ার প্রায় তিন বছর পরে মুক্তি পেয়েছে তার দ্বিতীয় এ্যালবাম 'আর একটিবার'। এই এ্যালবামের গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি গানের সুর করেছেন তিনি। 'আর একটিবার' এ্যালবামের 'বাজি' গানটির মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে এক প্রকার বাজি রেখেই যিনি সঙ্গীতকে জীবনের মূলব্রত হিসেবে নিয়েছেন, তিনি টাঙ্গাইলের তথা দেশের গর্ব বেলাল খান।

নিজের গানে সুর করার পাশাপাশি অন্যান্য শিল্পীও তার সুরে গান গেয়েছেন। তার সুরে এ পর্যন্ত যে সকল গুণী শিল্পী কণ্ঠ দিয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেবী নাজনীন, মমতাজ, ফাহমিদা নবী, সামিনা চৌধুরী, আলম আরা মিনু, মনির খান, কনা, ন্যান্সি, রূপরেখা ব্যানার্জি, ইমরান, লিজা, পড়শিসহ অনেকে।

টিভি প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশে এবং দেশের বাইরে লাইভ কনসার্টে অংশগ্রহণ করে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মাহমুদা খানমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসারের শোভা বর্ধন করছে পুত্র নাওয়াফ খান ও কন্যা তাবিহা খান।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমরা সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি নিজেদের অবস্থানে থেকে সৎভাবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি, তবেই একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।"

লিজু বাউলা

সঙ্গীত শিল্পী

শত কর্মব্যস্ততার মাঝে শুধুমাত্র আত্মিক চাহিদা পূরণের তাগিদে সংগীতকে যারা মাথার মুকুট করে নিয়েছেন তাদের একজন লিজু বাউলা। তার পারিবারিক নাম সিরাজুল ইসলাম। ভিন্ন পেশার হয়েও সুরের সাধনায় দিন কাটে তার। ভালোবেসে কণ্ঠে তুলেছেন লোকগান। শেকড়ের ঘ্রাণযুক্ত মাটির সুরে শ্রোতাদের বিমোহিত করে তিনি বিচরণ করছেন সংগীতাঙ্গনে।

লিজু বাউলার জন্ম টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার জোতআতাউল্লাহ গ্রামে। তার পিতা সুরুজ্জামান ছিলেন চাকরিজীবী আর মা লুৎফুন্নাহার গৃহিণী। লিজু শৈশব-কৈশোরে বেড়ে উঠেছে গ্রামেই।

লিজু বাউলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পরে তিনি ফলদা রাম সুন্দর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ভর্তি হন ভূয়াপুরের প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক এবং সরকারি সা'দত কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

লিজু বাউলার জন্ম একটি সংস্কৃতিপ্রেমি পরিবারে। পরিবারের অনেকেই ছিলেন গান বাজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ছোটবেলায় চাচাদের দেখে লিজু সংগীতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। সংগীতে তার হাতেখড়ি হয় উত্তম কুমার দাস ও রাসেল কবীরের কাছে। পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগীতের পাঠ নেন সত্যেন সেন সংগীত বিদ্যালয়ে। সেখানে নুরুজ্জামান স্বপনের অধীনে দুই বছর মেয়াদি কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন ইতি নিয়োগীর কাছে। পরবর্তী সময়ে উদীচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে লিজু দেশের বিখ্যাত সব সংগীতজ্ঞদের কাছে জ্ঞান আহরণ করেন। তাদের মধ্যে সুবীর নন্দী, তিমির নন্দী, ওস্তাদ শাহীন সরদার ও কলকাতা কয়ারের পরিচালক কল্যাণ সেন ভরাট উল্লেখযোগ্য।

মেধাবী কণ্ঠশিল্পী লিজু বাউলা সংগীতে নিয়মিত হন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। সে সময় তিনি গড়ে তুলেছিলেন টাচ নামে একটি ব্যান্ড। এরপর বিভিন্ন মহাজনের গান কণ্ঠে তোলার পাশাপাশি নিজের মৌলিক গানও করছেন তিনি। পাশাপাশি গানের একটি স্কুল এবং একটি মিউজিক্যাল স্টুডিও করেছেন তিনি। নিজের গানের পাশাপাশি টাঙ্গাইলের স্থানীর শিল্পীদের গান তৈরি করেন সেই স্টুডিওতে। এছাড়া নিয়মিত স্টেজ শোর সঙ্গেও সম্পৃক্ত রয়েছেন এই গায়ক।

লিজুর ভবিষ্যতের ভাবনাও সংগীতকেন্দ্রিক। প্রান্তিক অঞ্চলের যেসকল সংগীতশিল্পী অর্থাভাবে ঢাকায় গিয়ে গান তৈরি করতে পারেন না, তাদের জন্য কিছু করার স্বপ্ন আছে লিজুর। পাশাপাশি নিজের গানের স্কুলের মাধ্যমে সুরের বীজ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি।

ব্যক্তিজীবনে লিজু একটি কন্যাসন্তানের পিতা। তার স্ত্রী রুখসানা ইসলাম লিসা একজন তরুণ উদ্যোক্তা। পেশাগত জীবনে এই গায়ক একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

২০১০ খ্রিস্টাব্দে মেধাবী এই কণ্ঠশিল্পী জাতীয় গণসংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে তার সুর করা ও গাওয়া গানকে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন মেলার জাতীয় থিম সং হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এছাড়া ৩০ টি এর মত মৌলিক গান রয়েছে। ইতোমধ্যে কলকাতার একটি শর্ট ফিলম Pay & use এ টাইটেল সংগীত করেন। সম্প্রতি পূর্ণীজল গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এবং মায়াবতী সিনেমার টাইটেল সংগীত-এর কাজ চলমান।

খন্দকার ফারহানা রহমান সোমা

সহকারী পরিচালক, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিক্ষায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জেলা টাঙ্গাইল। শুধু তাই নয়; একই সাথে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও টাঙ্গাইলের নাম স্বমহিমায় উজ্জ্বল। টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত নাম খন্দকার ফারহানা রহমান। তবে লোকমুখে সোমা খন্দকার নামেই পরিচিত। টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলায় জন্ম হলেও শৈশব থেকেই টাঙ্গাইল সদরে বাস। পিতা খন্দকার হাবিবুর রহমান পেশায় আইনজীবী হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সংস্কৃতিমনা প্রগতিশীল মানুষ। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের করাচি নজরুল ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পিতার সংস্কৃতিচর্চা দেখেই মূলত সোমা খন্দকারের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তার সরকারি চাকরিজীবী মাতা মনোয়ারা ইয়াসমিন তাকে এ বিষয়ে সবসময় উৎসাহ দিতেন। সোমা খন্দকারের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি জেলা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলে। এরপর কয়েক বছর বিন্দুবাসিনী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে জেলা সদর স্কুল হতে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর সরকারি কুমুদিনী কলেজ হতে উচ্চমাধ্যমিক এবং পরবর্তীকালে একই প্রতিষ্ঠান হতে বিএ এবং সমাজকল্যাণে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

পিতামাতার সাত সন্তানের মাঝে তিনিই ছিলেন ব্যতিক্রম। শৈশব থেকেই তিনি কবিতা আবৃত্তি, গান, অভিনয় চর্চা করেন। স্কুল কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার সফল পদচারণা ছিল।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আব্দুর রহমান রককু সাহেবের হাত ধরেই তিনি প্রথম নাট্য জগতে পা রাখেন। ফজলুর রহমানের পরিচালনায় বিটিভিতে প্রচারিত একটি নাটকে তিনি প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিটিভির তালিকাভুক্ত অভিনয় শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বেতারে তালিকাভুক্ত সদস্য হন। তিনি মঞ্চ নাটকে উপস্থাপনা, আবৃত্তি ও বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে পঞ্চাশটিরও বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন।

তিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে শিল্পকলা একাডেমি নেত্রকোণায় জেলা কালচারাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর টাঙ্গাইল জেলায় আসেন। টাঙ্গাইলে কয়েক বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি শিল্পকলা একাডেমি ঢাকায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

এছাড়াও তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের সদস্য। টাঙ্গাইল যুব সমিতির সদস্য। স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা-এর সদস্যসহ বেশ কিছু সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোণার তানভির জাহান চৌধুরীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী ব্যবসায়ী। সুখময় সংসারের শোভা বর্ধন করেছে একমাত্র পুত্র ফারহান জাহান চৌধুরী।